প্রথম সংস্করণ—শ্রাবণ ১৩৬৪

প্রকাশক—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ন্যাশনাল পাবলিশার্স

১৪৫বি, সাউথ সিথি রোড

কলিকাতা-২

মুদ্রাকর—স্থকুমার চৌধুরী

বাণীশ্রী প্রেস

৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৬

বাধাই—দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

বৈঠকখানা রোড

কলিকাতা.

প্রচ্ছদ শিল্পী

স্থখেন গুপ্ত

উৎসর্গ

নাট্যাচার্য্য

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

চিত্রণের কথা আমি বলচি না, তবে সব কিছুব মধ্যে যদি কিছুটা ঐ সব দিক দিয়ে নিয়ম লঙ্ঘন হযও তাতে করে নাট্যরসত ক্ষুণ্ণ হয়ই না বরং আরো নাটকীয় ভাবে দানা বোধ ওঠে এই আমার ধারণা।

চরিত্র চিত্রণ ও বিষয় বস্তুর মধ্যে যদি খানিকটা নাটকীয় নীতির চমক, বেশভূষা ও পরিবেশেব মধ্যে এবং বাচনে সাধারণ ছাককাটা ঘরোয়া নিয়মকানুনেব বিচ্যুতি ঘটেই তাতে করে লজ্জার কিছু নেই! একটা কথা এখানে স্পষ্ট করে অবিশ্যি বলতে চাই সব নাটকই মঞ্চে অভিনয় উপযোগী ও অভিনয় উপভোগ্য নয়। বিশেষ কবে যে সব নাটক সাহিত্যেব কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েচে! আমার ধারণা নাট্য সাহিত্য ও অভিনয় উপভোগ্য নাটককে এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে সাহিত্যের কষ্টি পাথরে থাকাই করতে গেলে বোধ হয় ভুলই হবে।

সমালোচকের দল বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মঞ্চেসফল অভিনীত নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে ঐ বড় কথাটাই ভুলে যান। কারণ বিশ্বসাহিত্যে এমন বহু নাটক লেখা হয়েচে সাহিত্যের মর্যাদায় যে সব নাটক অতুলনীয় সম্মানে স্বীকৃতি লাভ করচে কিন্তু মঞ্চে অভিনয় করতে গিযে ব্যর্থতায পবিণত হয়েচে। তার মানে এ নয় যে, সে নাটককে রূপায়িত করবার জন্য যোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভাব বা তাদের অভিনয় নৈপুণ্যেব ঘাটতিই অসাফল্যের হেতু! তার কারণ হচ্ছে মঞ্চেরও একটা নীতি বা নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিত আছে যেটার হয়ত অভাব থেকে যায ঐ শ্রেণীর নাটকের বিষয় বস্তু, চরিত্র চিত্রণ, সংস্থানের ও পরিবেশের মধ্যে।

চৌধুরী বাড়ির চরিত্র, দৃশ্যপট, ঘটনা ও সংলাপ আমাদের দেশেরই এমন একটা কালের যে সময় জমিদাররাই ছিল প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা! তাদের অসীম ক্ষমতার স্বৈরাচার, দম্ভ, শাসকীয় মনোবৃত্তির এক ছবিই আমি চৌধুরী বাড়ি নাটকে এঁকেচি এবং অভিনয়কালে সর্বতোভাবে সেই কথাটা স্মরণ রাখলেই আমার মনে হয় এর নাটকীয় রস দানা বেধে উঠ্‌তে পারবে।

॥ **লেখক** ॥

নাটকে যারা আছে

রাজেশ্বর চৌধুরী

জনার্দন রায়

নিশানাথ আচার্য

চন্দ্রকুমার

সূর্যকান্ত

শ্যামাকান্ত

রঘুনন্দন

নিশাকর তর্কচঞ্চু

মাধব

কালু

কেতু

* *

জাহ্নবী

অপর্ণা

সরযূ

মাধবী

অন্যান্য মেয়েরা,

বোষ্টমী, ইত্যাদি।

নাটকের রচনাকাল : ২রা ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

প্রথম গর্ভাঙ্ক

॥ দৃশ্য ঃ এক ॥

[যবনিকা উত্তোলিত হওযাব পবও কিছুক্ষণ মঞ্চ অন্ধকার অস্পষ্ট থাকবে আর অন্ধকাব থেকে শোনা যাবে সেতারে বসন্তবাহাব আলাপ। ক্রমে তারপর একটু একটু কবে মঞ্চেও আলোক প্রস্ফুটিত হতে থাকবে। তখন দেখা যাবে, ঘবের এককোণে পিলসুজেব উপরে জ্বলছে একটি মৃৎপ্রদীপ শিখা। তাবই স্বল্প আলোছায়ার মধ্যে দেখা যাবে জীর্ণ কোন বাড়িব জীর্ণ কক্ষ। ইঁট্ বের কর।, চুণ বালি খসা। একপাশে দেওয়ালে একটি জানালা, বাহিবে থেকে তাব কবাট ভেজানো। আবো একটি দ্বারপথ দেখা যাবে, দরজা ভিতর থেকে অর্গল বন্ধ। ঠিক মৃৎপ্রদীপের আলোয় যেটুকু ঘর আলোকিত হওয়া প্রয়োজন তার বেশি মঞ্চে আলোক সম্পাত হবে না। ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র সামান্যই। একধারে চৌকীর 'পরে একটি সাধারণ শয্যা বিস্তৃত। একটি মাটির কলসী, দড়ির আলনায় খান দুই শাড়ী ঝুলছে। মৃদু আলোয় দেখা গেল ১৮।১৯ বৎসরের একটি তরুণী সেতার বাজাচ্ছে। তার পরিধানে রাজপুতানী ঢঙের শাড়ী ও গায়ে কাচুলী, মাথার চুল বেণীর আকারে পৃষ্ঠদেশে লম্বমান! সহসা দেখা গেল ধীরে ধীরে বন্ধ জানালার কবাট ঈষৎ ফাঁক হয়ে গেল ও জানালাপথে তরুণ চন্দ্রকুমারের মুখখানি উঁকি দিল। ঘরের মধ্যে বসে যে তরুণী সেতার বাজাচ্ছিল তার নাম সরযূ। চন্দ্রকুমার মৃদু কণ্ঠে জানালাপথে ডাকে।]

চন্দ্র। সরযূ!

[সরযূর সাড়া পাওয়া যায় না, সে যেমন বাজাচ্ছিল তেমনি বাজাতে থাকে। চন্দ্রকুমার আবার ডাকে।]

সরযূ !

[এবারে সরযূ চমকে জানালার দিকে তাকায়।]

সরযূ। কে ! চন্দ্র !

চন্দ্র। হাঁ, দরজাটা খোল।

[সরযূ সেতাবটা দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিযে রেখে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই চন্দ্রকুমার এসে ঘরে ঢুকল। সবযূ আবার দরজায় অর্গল তুলে দিল। চন্দ্রকুমারের বয়স ২৪।২৫ এর বেশি নয়। সুশ্রী, বলিষ্ঠ চেহারা। পরিধানে মালকোচা আঁটা ধুতি, গায়ে বেনিয়ান। পায়ে শাদা নাগরা।]

সেতার বাজাচ্ছিলে বুঝি ?

সরযূ। হুঁ।

চন্দ্র। আমি তো ভেবেছিলাম এত রাত হয়ে গেছে, বুঝি ঘুমিয়েই পড়েছো। ডেকে সাড়াই পাবো না।

[সরযূ কিন্তু চন্দ্রকুমারের আগমনে বা কথায় বার্তায় সে রকম কোন আগ্রহও দেখায় না, বিশেষ সাড়াও দেয় না। ব্যাপারটায় চন্দ্রকুমার যেন একটু বিস্মিতই হয়। সরযূর আরো কাছে এসে ডাকে।]

সরযূ !

[সরযূ মুখ তুলে তাকায়। বিষণ্ণ কাতর চাউনি]

কি হয়েচে সরযূ ! তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন—

সরযূ ! তুমি চলে যাও চন্দ্র !

চন্দ্র। [বিস্ময়ে] চলে যাবো! সরযূ—

সরযূ। হাঁ, সূর্যকান্ত এসেচে।

চন্দ্র। [সবিস্ময়ে] সূর্যকান্ত! কে সে! তার কথা তোমার মুখে কোন দিন আগে শুনেচি বলে তো মনে পড়চে না।

সরযূ। না। এতদিন তোমাকে বলিনি কুমার, ঐ সূর্যকান্তের ভয়েই গভীব রাত্রে একদিন অপর্ণা আমাকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বের হয়ে পড়ে। সারাটা রাত ঘোড়াটা আমাদের দুজনকে পিঠে নিয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট একটা খালের পাড়ে এসে, লাফিয়ে সেটা পার হতে গিয়ে বেটক্কর পড়ে গিয়ে ভীষণ জখম হয়ে আর উঠে দাঁড়াতে পারলো না।

চন্দ্র। তারপর?

সরযূ। সে যে কি এক সঙ্গীন মুহূর্ত। চেয়ে দেখি খালের ওপারে দুর্ভেদ্য এক জঙ্গল। অপর্ণা তখন অনন্যোপায় হয়ে আমাকে নিয়ে খাল সাঁতরেই পার হয়ে এসে প্রবেশ করলো সেই জঙ্গলের মধ্যেই—

চন্দ্র। বুঝতে পারচি, যখের জঙ্গলের পাশ দিয়েই চন্দ্রহারের মত বেষ্টন করে বয়ে গিয়েচে বৌ ডুবীর খাল।

সরযূ। একটা রাত আর একটা দিন ক্রমাগত সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটচি তো হাঁটচিই; ক্লান্ত ক্ষুধার্ত, পিপাসায় কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে যাচ্ছে তবু থামবার উপায় নেই। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে এক সময় দূর থেকে আমাদের নজরে এলো এই বাড়িটা, জঙ্গল শেষ হবার পর।

চন্দ্র। তারপর?

সরযূ। ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি ছিন্ন মলিন শয্যার 'পরে শুয়ে এক বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে জল জল করচে। ঘরের কোন সরাইয়ে জল ছিল, অপর্ণা সেই সরাই থেকে একটা গ্লাসে জল ঢেলে সেই বৃদ্ধকে জল পান করালো।

[একটু থেমে সরযূ আবার বলতে লাগলো।]

বৃদ্ধ কিন্তু বাঁচলো না। পরের দিন দুপুরের দিকে মারা গেল। অপর্ণা আমাকে নিয়ে এইখানেই থেকে গেল।

চন্দ্র। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে নির্জন এই বাড়িতে থাকতে—ভয় হলো না তোমাদের ?

সরযূ। না। রাজপুতের মেয়ে অত সহজে তাদের ভয় হয় না। কিন্তু একেবারে দুজনই নই আমরা, বৃদ্ধের এক ভৃত্য ছিল নন্দুয়া। কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে সে দেশে গিয়েছিল, দিন পাঁচেক বাদে সে এসে হাজির হলো। সেও আমাদের ছেড়ে দিল না।

চন্দ্র। একটা কথা সরযূ, মনে যদি কিছু না করো !

সরযূ। কেন, মনে করবো কেন, বল না !

চন্দ্র। বলছিলাম কি, তোমাদের দিন চলে কি করে ?

সরযূ। অপর্ণার কিছু অলঙ্কার ছিল, সঙ্গে করেই সে নিয়ে এসেছিল একটা পোটলায় বেঁধে। সেই বেচেই অপর্ণা চালাচ্ছে। তবু এই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে পড়ো বাড়িতে বেশ শান্তিতেই ছিলাম। ভেবেছিলাম হয়ত সূর্যকান্ত আমাদের খোঁজ আর পাবে না। কিন্তু ঠিক সন্ধান করে করে এখানেও এসে হাজির হয়েচে।

চন্দ্র। কিন্তু কে ঐ সূর্যকান্ত তাতো কই এখনো বললে না।

সরযূ। অপর্ণারই কেমন যেন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় হয় শুনেচি!

[হঠাৎ এমন সময় ঘরের একটি দ্বারের বন্ধ কবাটের গায়ে করাঘাত ও সূর্যকান্তর কণ্ঠস্বর শোনা গেল নেপথ্যে।]

সূর্যকান্ত। [নেপথ্যে] সরযূ! সরযূ—দরজা খোল!

সরযূ। [ভীতকণ্ঠে] সর্বনাশ। সূর্যকান্ত! কি হবে এখন?

চন্দ্র। হয়েচে কি, অত ভয়ই বা পাচ্ছো কেন? আসুক না ও ঘরে, দাও দরজা খুলে।

[বলতে বলতে চন্দ্রকুমারই এগিয়ে যায় দরজা খুলে দিতে। এগিয়ে গিয়ে তাকে বাধা দিয়ে সরযূ বলে,—]

সরযূ। না, না—তুমি জানোনা, জানোনা তুমি ওকে কুমার। ও সাপের চেয়ে হিংস্র, খল! সাক্ষাৎ শয়তান। নীচ—

চন্দ্র। আমি নিরস্ত্র নই সরযূ!

[চন্দ্রকুমার কোমরে গোঁজা শাদা বাঁটওয়ালা ছোরাটা দেখালো।]

সরযূ। না, না—তুমি ঐ পিছনের জানালা দিয়ে পালাও।

[দরজায় তখন মুহুর্মুহু করাঘাত পড়চে।]

সূর্যকান্ত। [নেপথ্যে] সরযূ, দরজা খুলচো না কেন! সরযূ!

[চন্দ্রকুমারকে একপ্রকার ঠেলতে ঠেলতে জানালার কাছে নিয়ে জানালা খুলে সেই জানালা পথে সরযূ তাকে ঘর থেকে বের করে দিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে চন্দ্রকুমারের পায়ের একপাটি জরির নাগরা ঘরের মধ্যেই থেকে গেল। কারোই সেটা তাড়াতাড়িতে ব্যস্ততায় নজরে এলো না। সরযূ জানালা বন্ধ করে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই সূর্যকান্ত ঘরে এসে প্রবেশ করলো।]

সূর্যকান্ত। কানে তুলো দিয়ে ছিলে নাকি! এত জোরে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি—

[নির্বাক সরযূ সূর্যকান্তর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।]

সরযূ!

[সরযূ নির্বাক।]

একটু আগে ঘরে কে ছিল?

সরযূ। কেউ নাতো!

[হঠাৎ এমন সময় খোলা দরজা পথে ঘরে এসে ঢুকলো অপর্ণা! বয়েস তার ত্রিশের উর্ধ্বে! এখনো আঁটো সাটো গড়ন দেহের। পাড়হীন শাদা একখানা শাড়ী হিন্দুস্থানীদের মত করে পরা। মাথায় ঘোমটা। নিরাভরণ।]

অপর্ণা। কি! ব্যাপার কি সূর্যকান্ত! এতরাত্রে এঘরে এসে চেঁচামেচি শুরু করেচো কেন?

সূর্যকান্ত। জবাব দাও সরযূ! আমি জানতে চাই, কে তোমার ঘরে একটু আগে এসেছিল! কার সঙ্গে তুমি কথা বলছিলে?

অপর্ণা। কি পাগলের মত আবোল তাবোল বকচো সূর্যকান্ত! এত রাত্রে কে আবার এঘরে আসবে। আর এখানে আমাদের কার সঙ্গেই বা পরিচয় আছে! আছি তো জঙ্গলের একপ্রান্তে এক ভাঙ্গা বাড়িতে পড়ে।

সূর্যকান্ত। প্রশ্নটা আমি তোমাকে করিনি অপর্ণা! যাকে করেছি, তার মুখ থেকেই আমি জবাবটা চাই। সরযূ—

অপর্ণা। [কঠিন কণ্ঠে] না। ও তোমার কথার জবাব দেবে না। যা সরযূ তুই আমার ঘরে যা!

[অপর্ণার নির্দেশে সরযূ ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হতেই সূর্যকান্ত বাধা দিয়ে ওঠে।]

সূর্যকান্ত। দাঁড়াও সরযূ!

অপর্ণা। না! যা সরযূ!

সূর্যকান্ত। তাহ'লে ওকে তুমি বলতে দেবে না অপর্ণা!

অপর্ণা। না। কারণ বলবার কিছুই নেই।

সূর্যকান্ত। কিছুই নেই!

অপর্ণা। না।

সূর্যকান্ত। ও। কিন্তু জানতে পারি কি, [নাগরাটার দিকে চোখের ইঙ্গিত করে] ঐ যে জানালার সামনে পড়ে আছে জরির নাগরাটা ওটা কার!

[অপর্ণা ও সরযূ যুগপৎ একইসঙ্গে সূর্যকান্তর কথায় নাগরাটার দিকে দৃষ্টিপাত করে।]

নিশ্চযই ওটা তোমার বা সরযূর নয়। কি! একেবারে যে চুপ! কথা নেই মুখে আর কারো। বল, জবাব দাও, ঐ পাদুকাখানি কার?

অপর্ণা। যা সরযূ এঘর থেকে।

[সরযূ ঘর ছেড়ে চলে গেল।]

সূর্যকান্ত। হুঁ! দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই নির্জন জঙ্গলে পড়ো বাড়ির মধ্যেও নাটক বেশ জমিয়ে তুলেছো দুজনে!

অপর্ণা। সূর্যকান্ত!

সূর্যকান্ত। চোখ রাঙাতে হয় অন্যকে রাঙিয়ো সুন্দরী! এ শর্মাকে নয়।

[তীব্র দৃষ্টিতে বারেকের জন্য সূর্যকান্তর দিকে তাকিয়ে অপর্ণা ঘর ছেড়ে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু বাধা দিল তাকে সূর্যকান্ত]

দাঁড়াও অপর্ণা! তোমাকে একটা কথা আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই!

অপর্ণা। কথা!

সূর্যকান্ত। হাঁ, আশা করি ভুলে যাওনি তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথাটা! তোমার দেবর যুধাসিংয়ের হাত থেকে তোমাদের যেদিন আমি রক্ষা করেছিলাম, আমাকে তুমি কথা দিয়েছিলে, যা আমি চাইবো তাই তুমি আমাকে দেবে—। আমি বলেছিলাম, সময় হলে জানাবো। মনে আছে?

অপর্ণা। কি বলতে চাও?

সূর্যকান্ত। বলতে চাই, সরযূকে আমি বিবাহ করতে চাই।

অপর্ণা। কি বললে?

সূর্যকান্ত। কথাটা শুনতে না পাবার মত করে আস্তে তো বলিনি!

[অপর্ণা আর একবার সূর্যকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে ঘর ছেড়ে যাবার জন্য দরজার দিকে অগ্রসর হয়।]

কি! জবাব না দিয়ে চলে যাচ্ছো যে?

অপর্ণা। জবাবটা তুমি একান্তই শুনতে চাও সূর্যকান্ত!

সূর্যকান্ত। নিশ্চয়ই।

অপর্ণা। তবে জেনো, নিজের হাতে বিষ দিয়ে সরযূকে আমি হত্যা করবো তবু—

সূর্যকান্ত। তবু আমার হাতে তাকে দেবে না!

অপর্ণা। ঠিক তাই!

সূর্যকান্ত। বেশ। তাহলে তুমিও শুনে যাও, সরযূকে আমি বিবাহ করবোই !

অপর্ণা। জোর করে ?

সূর্যকান্ত। প্রয়োজন হলে তাই ! আশা করি এই কয়মাসেই সূর্যকান্তকে তুমি ভুলে যাওনি !

অপর্ণা। নিশ্চয়ই না। আর তুমিও আশা করি ভোলনি অপর্ণাকে।

সূর্যকান্ত। অপর্ণা !

অপর্ণা। শোন সূর্যকান্ত, অনেক অত্যাচার সকলের আমি এতকাল সহ্য করে এসেচি মুখবুজে, কিন্তু আর করবো না। আমি তোমাকে বলে রাখলাম, কাল প্রত্যূষেই এখান থেকে তুমি চলে যাবে !

সূর্যকান্ত। চলে যাবো, শূন্য হাতে ! [মৃদু হেসে] শোন অপর্ণা, বিবাদে আমার এতটুকু ইচ্ছা নেই ! কেন মিথ্যে ঝামেলা বাড়াচ্ছো, শুভকার্যে আর বাগড়া দিও না।

অপর্ণা। [আবার দরজার দিকে এগুতে এগুতে] আমার জবাব তো তুমি পেয়েচো।

সূর্যকান্ত। এই তা হলে তোমার শেষ জবাব ?

অপর্ণা। হাঁ, শেষ জবাব।

[অপর্ণা ঘর ছেড়ে চলে যায়, সূর্যকান্ত তার গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে।]

॥ মঞ্চ ঘুরে গেল ॥

॥ দৃশ্য ঃ দুই ॥

[চৌধুরী বাড়ি। জমিদার রাজেশ্বর চৌধুরীর অন্দর মহলের সুসজ্জিত একটি কক্ষ। প্রৌঢ় জমিদার রাজেশ্বর চৌধুরী, দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় বাবরি চুল, পরিধানে ধুতি, গায়ে ফিতে বাধা বেনিয়ান, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা, পাকানো গোঁফ। চোখে মুখে একটা স্পষ্ট দাম্ভিকতা। সামানে চৌকীতে ফরাস পাতা, ফরাসের উপরে কোষ্ঠি নিয়ে বিচারে মগ্ন প্রৌঢ় দৈবাচার্য। রাজেশ্বর অস্থিরভাবে ঘবের মধ্যে পায়চারি করচেন। মঞ্চ ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজেশ্বরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।]

বাজেশ্বর। কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছো দৈবাচার্য যে, এই চৌধুরী বাড়িব দীর্ঘ দেড় শত বৎসবের ইতিহাস, পৃষ্ঠাব পব পৃষ্ঠা কীর্তিমান চৌধুরীদের বলিষ্ঠ হাতেই লেখা হয়েচে বংশ পরম্পরায়। ভীরুর মত ভাগ্যের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা কোনদিনই যেমন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেনি, আজও থাকবে না।

দৈবাচার্য। কিন্তু চৌধুরীমশাই—

রাজেশ্বর। বললাম তো, গণনা তোমার ভুলই হোক বা নির্ভুলই হোক, তোমাদের জ্যোতিষী গ্রহ চক্রের কৃপা দৃষ্টি থাক বা না থাক, জেনো আমার মনোনীতা ঐ কন্যার সঙ্গেই আমার পুত্র চন্দ্রের বিবাহ দেবো স্থির করেচি। তোমাকে শুধু তাই বলেছিলাম, একটি শুভ দিন স্থির করে দেওয়ার জন্য, এ বংশের চিরাচরিত প্রথানুসারে। বংশের প্রথা, নইলে সেটাও আমি মানতাম না—

দৈবাচার্য। কিন্তু চৌধুরী মশাই, কন্যার পঞ্চমে রাহু, ভৌমদোষ রয়েচে। আর গণনাও আমার নির্ভুল!

রাজেশ্বর। তবু এ বিবাহ হবে। তোমার গণনা যদি নির্ভুল হয়ই তবু জেনো রাজেশ্বর চৌধুরী অলিখিত সে ভাগ্যের কাছে মাথা নীচু করবে না।

দৈবাচার্য। আপনি রাজা, আর আমি আপনারই আশ্রয়ে সামান্য প্রজা মাত্র। যুক্তি থাক বা নাই থাক, আপনার কথাই আমাকে মেনে নিতে হবে বৈকি! তবে একথাও আমি বলে যাই চৌধুরীমশাই, বিধিলিপি অখণ্ডনীয়—নইলে বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয়ে আপনিই বা—

রাজেশ্বর। তুমি এবার আসতে পারো দৈবাচায—

[প্রাণাম জানিয়ে দৈবাচায তার পুঁথিপত্র নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রাজেশ্বর পুর্ববৎ পায়চারি করতে করতে বলেন—]

বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! [একটু থেমে] রঘুনন্দন!

[ডাকা মাত্র যম সদৃশ্য বিরাট বলিষ্ঠ চেহারা, মালকোছা এঁটে কাপড় পরা, মাথায় বাবরি চুলে লাল একটা ফেটি বাধা, খালি গা, পাইক সর্দার রঘুনন্দন এসে ঘরে ঢুকে নত হয়ে সেলাম জানাল নিঃশব্দে।]

রঘু। হুজুর।

রাজেশ্বর। নায়েব মশাইকে নীচে থেকে গিয়ে ডেকে আন, এঘরেই নিয়ে আয়।

[রঘুনন্দন চলে গেল। রাজেশ্বর আপন মনে বলেন—]

বিধিলিপি। দেখা যাক্, রাজেশ্বর চৌধুরীর হাতের পেশীর জোর বেশি, না, বিধাতা পুরুষের হাতের কলমেরই জোর বেশি।

[রাজেশ্বরের স্ত্রী জাহ্নবী এসে ঘরে প্রবেশ করলো। চওড়া লাল পাড় গরদের শাড়ী পরিধানে। গা ভর্তি গহনা। মাথার উপরে অবগুণ্ঠন কপালে গোলাকার বড় একটি সিন্দুরের টিপ। সিঁথিতে সিন্দুর। স্ত্রীকে দেখে সবিস্ময়ে রাজেশ্বর তার দিকে তাকান !]

জাহ্নবী। আমাকে ডেকেছিলে ?

রাজেশ্বর। হাঁ, চন্দ্রকুমার কোথায়, তোমার ছেলে ?

জাহ্নবী। এত ভোরে কোথায় আর থাকবে, ঘরেই হয়ত শুয়ে আছে—

রাজেশ্বর। না। কিছুক্ষণ আগেও তার ঘর আমি দেখে এসেচি। ঘরে তো সে নেইই, আব শয্যা দেখেও মনে হলো, রাত্রে শয্যা কেউ স্পর্শও কবেনি।

জাহ্নবী। কি বলচো, হয়ত ভোরে ঘুম থেকে উঠে কোথাও বের হয়েচে,—

রাজেশ্বর। ভুলে যাচ্ছো তুমি বৌরাণী ! রাজেশ্বর চৌধুরীর এই দুটো চোখ ছাড়াও আব এক জোড়া চোখ আছে। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই সে বের হয়েছে এখনো ফেরেনি। আর শুধু কাল রাত্রেই নয়, ইদানিং সে প্রতি রাত্রেই কিছুদিন ধরে বাইবেই কাটিয়ে আসচে। [একটু থেমে] কি ! জবাব দিচ্ছ না যে !

জাহ্নবী। তা যদি করেই থাকে, এ বাড়ির ইতিহাসে ছেলেদের পক্ষে সেটা কি খুব একটা নতুন কথা !

রাজেশ্বর। না, নতুন কথা নয়। কিন্তু একজায়গায় তুমি ভুল করচো, এ বাড়ির ছেলেদের সে বাইরেটা বরাবর থাকতো এই

চৌধুরী বাড়িরই চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ। চৌধুরী বাড়িরই জলসাঘরে। আর তাই যদি সে কাটাতো তাতে আমারও দুঃখ বা লজ্জার কিছু থাকতো না। তাইতো আমি জানতে চাই, প্রতি রাত্রে তোমার ছেলে কোথায় যায়?

জাহ্নবী। জানিনা।

রাজেশ্বর। এত সহজে জানিনা বললেতো চলবে না বড়বৌ। কারণ জানবার কথাতো তোমারই।

জাহ্নবী। আমারই!

রাজেশ্বর। তাই নয় কি! পুত্রগর্বে গরবিনী জননী তুমি তার। স্নেহে অন্ধ! আর সেও ত্রিসংসারে দেখি একমাত্র তোমাকেই জানে—

জাহ্নবী। তাই যদি হয়েই থাকে। সেটা কি খুব একটা অপরাধের।

রাজেশ্বর। জাহ্নবী!

জাহ্নবী। হাঁ, চিরদিন শাসনই করে এসেচো ছেলেকে। শাসনের বাইরেও পিতার কাছে সন্তানের যে একটা দাবি থাকতে পারে, কোনদিন তাকে সেটুকু বুঝতে বা জানতে দিয়েছো কি!

রাজেশ্বর। চিরদিন তাকে শুধু শাসনই করে এসেচি। আর কিছুই সে আমার কাছে পায় নি!

জাহ্নবী। না। তা যদি পেতো, তবে আজ এভাবে পিতা হয়ে ছেলের সংবাদ জানবার জন্য আমাকে এসে তোমার চোখ রাঙাবার প্রয়োজন হতো না। যাক সে কথা, শুনলাম দৈবাচার্য নিষেধ করা সত্ত্বেও নাকি তুমি চন্দ্রের বিয়ে—

রাজেশ্বর। হাঁ, নিশ্চিন্দপুরের বড় তরফের জনার্দন রায়ের মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গেই আমি স্থির করেছি।

জাহ্নবী। কন্যার ভৌমদোষ আছে তা সত্বেও!

রাজেশ্বর। তা সত্বেও! ওসব ভাগ্যলিপি টিপি আমি মানি না। ও দুর্বলের অস্ত্র! পুরুষেব পুরুষকার—তার ভাগ্যপথ সে নিজ শক্তিতেই তৈরী কবে নেয।

জাহ্নবী। কিন্তু শুনেছিলাম মেয়েটির গায়ের রঙ নাকি—

রাজেশ্বর। কে কি তোমাকে জানিযেচে আমি জানি না, তবে শুনে রাখো, সে মেয়ে এবাড়িতে এলে দেখবে ইতিপূর্বে চৌধুরী বাড়িতে অমন সর্বসুলক্ষণা মেয়ে বধূ হয়ে আসেনি।

জাহ্নবী। একেবারে পাকাপাকি ভাবে স্থির করবার পূর্বে চন্দ্রকে একবার—

রাজেশ্বব। কি বললে?

জাহ্নবী। মানে বলছিলাম, ছেলে বড় হয়েচে—

রাজেশ্বব। এর আগেও চৌধুরী বাড়িতে ছেলেবা বড় হয়েই বিবাহ করেচে। আর প্রত্যেকের বেলাতেই তাদের পিতা ও পিতামহের নির্বাচনই তাদের মেনে নিতে হয়েচে। আশা করি তোমার ছেলেও সেই নিয়মকেই মেনে নিতে পারবে।

জাহ্নবী। বেশ!

রাজেশ্বর। হাঁ, ছেলে ও ছেলের মা দুজনাই যেন মনে রাখে যে, চৌধুরী বাড়ির ইজ্জতের একটা দাম আছে। সামান্য একটা খেয়াল বা তুচ্ছ কারো আত্মতৃপ্তির জন্য সেইজ্জতের গায়ে রাজেশ্বর চৌধুরী কালি লাগাতে দেবে না।

জাহ্নবী। মানুষের প্রাণের চাইতেও কি সেই ইজ্জতের দাম বেশি ?

রাজেশ্বর। বসুমল্লিকের বাড়ির মেয়ে তুমি! চৌধুরীবাড়ির ঘরোয়ানার ইজ্জতের মূল্য তুমি কি বুঝবে! হুঁ! ইজ্জত!

[আর একটি কথাও না বলে জাহ্নবী নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।]

ইজ্জত! তুমি তো জানোনা জাহ্নবী, এই রাজেশ্বর চৌধুরীকেই একদিন বুক নিঙড়ে সে ইজ্জতের দাম দিতে হয়েছিল। ইজ্জতের দাম দিতে গিয়ে একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছিল, তার চোখের সামনে তার জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তবু সে সেদিন একটি কথা বলতে পারেনি। নিরুপায় বেদনায় শুধু দাঁড়িয়েছিল বোকার মত।

[বাইরে গলা খাকৃবির শব্দ শোনা যায় নায়েব শ্যামাকান্তর]

[চমকে] কে! শ্যামাকান্ত, এসো—

[নায়েব শ্যামাকান্ত এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। শ্যামাকান্ত বৃদ্ধ, মাথার চুল পাকা!]

শ্যামাকান্ত। আমাকে ডেকেছিলেন ?

রাজেশ্বর। কে, শ্যামাকান্ত, হাঁ শোন, আমার জবানীতে নিশ্চিন্দপুরের বড় তরফের জনার্দন রায়কে একটা চিঠি লিখবে—তার মেয়ে স্বর্ণলতার সঙ্গে চন্দ্রর বিবাহ স্থির!

শ্যামাকান্ত। যে আজ্ঞে।

রাজেশ্বর। শোন, আরো লিখবে আগামী মাসে প্রথম যে শুভদিনটি

পঞ্জিকাতে আছে, সেই তারিখেই বিবাহ হবে। তিনি যেন প্রস্তুত হতে থাকেন। চিঠিটা লিখে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি দস্তখত করে দেবো।

শ্যামাকান্ত। যে আজ্ঞে—

রাজেশ্বর। শোন, চিঠিটা আজই রঘুনন্দন দ্রুতগামী অশ্বে গিয়ে জনার্দনের বাবার হাতে যেন পৌঁছে দিয়ে জবাব নিয়ে আসে। যাও—হাঁ, শোন মাধবকে পাঠিয়ে দেবে।

[রাজেশ্বর খড়মের শব্দ তুলে চলে গেলেন। মঞ্চ ঘুরে যায়।

॥ দৃশ্য : তিন ॥

[চৌধুরী বাড়ির অন্দরের ঠাকুরঘর। সিংহাসনে শ্যামসুন্দরের যুগল মূর্তি। পিছন ফিরে জাহ্নবী পট্টবস্ত্র পরিহিতা, অর্ধাবগুণ্ঠন, গলায় আঁচল ও পৃষ্ঠদেশে এলানো সিক্ত কেশভার, ধ্যানস্থ। পাশে বসে ষোড়শী বিবাহিতা কন্যা মাধবী ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে একটি ভজন গাইচে।]

॥ গীত ॥

নিঃস্ব করে দাও গো মোরে
নিঃস্ব করে দাও।
ধূলায় এবাব লুটিয়ে দিয়ে
রিক্ত করে নাও।
নামিয়ে দিয়ে সকল বোঝা
এবার শুধু তোমায় খোঁজা,
দেখি তোমার চরণ দুটি
কেমন ধরতে নাহি দাও।
তোমার ভাষা বুঝিনে তাই
মিছেই কেঁদে মরি
(তুমি) মিশিয়ে আছো নিখিল প্রাণে
কেমন করে বরি ?
তোমায় ধরা ছোঁয়ার পিছে
লুকিয়ে থাকে ভাবনা কি যে
এবার পারের তরী ভিড়িয়ে দিয়ে
আপন করে নাও।

[গান শেষ হতেই চন্দ্রকুমার এসে ঘরে ঢুকলো।]

চন্দ্র। মা, মা—মাগো!

জাহ্নবী। [শশব্যস্তে] দাঁড়া বাবা, আসচি একটু অপেক্ষা কর।

চন্দ্র। না, শীগগিরি বের হয়ে এসো, নইলে এখুনি তোমার ঠাকুর ঘরে ঢুকে কিন্তু তোমাকে ছুঁয়ে দেবো—

[এগিয়ে আসে মায়ের দিকে ছেলে। জাহ্নবী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েচে।]

জাহ্নবী। ওরে, না, না—লক্ষ্মী বাবা এখনো ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়নি।

চন্দ্র। উহুঁ! শীগগিরি। ওয়ান-টু-থ্রি গোনার আগেই যদি না ধরা দাও, তোমার কালাপাহাড় তোমাকে ছুঁয়ে দেবেই!

জাহ্নবী। [কন্যা মাধবীর দিকে চেয়ে] তুই-ই তবে ভোগটা দে মাধু, পাগল যখন ক্ষেপেচে—

মাধবী। বয়ে গেছে আমার! তোমার ঠাকুর উপোসী থাকবে তো আমার কি?

[চন্দ্র ততক্ষণে মাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেচে।]

চন্দ্র। মা, মা, মাগো, আমার মা মণি। মা সোনা—

[মাকে আদর করতে করতে আড় চোখে বোন মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দ্র বলে]

দেখ মা দেখো, হিংসায় মাধু মুখপুড়ির মুখটা কেমন কালো হয়ে উঠেচে দেখো।

মাধবী। বুড়ো ধাড়ি ছেলে লজ্জাও করে না—

[মা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে]

চন্দ্র। মুখপুড়িটাকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আবার কেন আনতে গেলে বলতো মা! পরের ঘরে একবার বিদায় করা হয়েচেই যখন তখন আবার কেন!

মাধবী। হাঁ, তা বৈকি। একা একাই সব আদর পাবেন উনি! একা যেন ওরই মা—

চন্দ্র। ভাগ্ তোব আবার মা কিরে মুখপুড়ি! তোর মা তো রাজঘাটে। এখন তো নির্মলের মাই তোর মা!

[মাধবী জিভ ভ্যাঙচায় ভাইকে। তারপব ঘর থেকে বের হয়ে যায়।]

জাহ্নবী। চন্দ্র।

চন্দ্র। মা!

জাহ্নবী। আজকাল সারারাত নাকি তুই বাইবেই থাকিস?

চন্দ্র। কে বললে?

জাহ্নবী। যেই বলুক না কেন, যাস কোথায় তাই বলনা।

[চন্দ্র মাকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চৌকীর উপর বসিয়ে]

চন্দ্র। শুনবে কোথায় যাই!

জাহ্নবী। কোথায়?

চন্দ্র। ঘোড়ার পিঠে চেপে ঘুরে ঘুরে বেড়াই—

জাহ্নবী। সে কি রে! রাত্রে ঘোড়ার পিঠে চেপে—

চন্দ্র। হাঁ মা। রাত্রে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে কি যে আমার আনন্দ লাগে মা। চারিদিকে ঝুপ্সি ঝুপ্সি অন্ধকার আর তার মধ্যে আগুনের ফুলকির মতো জোনাকীর বাতিগুলো জ্বলচে আর নিবচে। ঝিঁঝির

ডাক, হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা নিশিবিহঙ্গের ডানার ঝাপ টা। যাবে, যাবে মা তুমি একদিন রাত্রে আমাব সঙ্গে!

জাহ্নবী। কি যে তোর উদ্ভট খেয়াল বাবা।

চন্দ্র। খেয়াল নয় মা, খেয়াল নয়। গল্পে শোননি, অমনি রহস্যে ঘেরা অন্ধকারের মধ্যেই তো লুকিয়ে থাকে সাতমহলা লৌহপুরী, যার খাসমহলের নিভৃতে ঘুমায় সোনার পালঙ্কে সেই স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা।

জাহ্নবী। চন্দ্র!

চন্দ্র। হাঁ মা, তাইতো খুঁজতে যে জানে, সেই পাবে কন্যার সন্ধান। তুমি দেখবে সেই কন্যা—

জাহ্নবী। পাগল।

চন্দ্র। পাগল নয় মা। সত্যি বলচি। সাতমহলা লৌহপুরী নয়, যখের জঙ্গলের ধারে নিভৃত একটি ভাঙ্গা পড়ো বাড়ির মধ্যে আছে সে কন্যা। যার কাজল কালো তু'টি চক্ষু, লতানো মেঘবরণ কেশের সাপের মত বেণী!

জাহ্নবী। চন্দ্র।

চন্দ্র। বিশ্বাস হলো না বুঝি? যাক্—সময় হলেই জানতে পারবে।

জাহ্নবী। চন্দ্র!

চন্দ্র। মা!

জাহ্নবী। উনি একটু আগে তোর খোঁজ করছিলেন যে—

চন্দ্র। বাবা! সর্বনাশ। কেন বলতো।

জাহ্নবী। বলছিলেন তোর বিয়ের কথা।

চন্দ্র। বিয়ে?

জাহ্নবী। হ্যাঁ রে!

চন্দ্র। কিন্তু তোমাকে তো কয়েকদিন আগেই বলে দিয়েচি মা, এখন আমাকে বিয়ের কথা বলো না।

জাহ্নবী। আমি তো বলিনি, উনিই বলছিলেন।

চন্দ্র। বাবাকে তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই হবে মা, লক্ষ্মীটি!

জাহ্নবী। কেন, তুই বলতে পারিস না।

চন্দ্র। না মা, বলতে তোমাকেই হবে। আর তাছাড়া আমি যাকে বিয়ে করবো মা, তাকে পছন্দ করে আনবো আমি নিজে—

জাহ্নবী। চুপ্, চুপ্—ওকথা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকবে না।

চন্দ্র। সে তুমি যাই বলো মা, আমার যে বৌ হবে, তাকে আমিই পছন্দ করে আনবো।

জাহ্নবী। চন্দ্র!

চন্দ্র। হাঁ মা, আর এও আমি জানি, পৃথিবীর আর কারো আশীর্বাদ না পেলেও আমার যে মনোনীতা সে তোমার আশীর্বাদ পাবেই। সেইটুকু যদি সে পায়, জানবো জগতের কোন অমঙ্গলই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক মা—। এখন আমাকে কিছু খেতে দেবে চলতো মা, আমার ক্ষিধেয় পেট চো চো করচে। এসো—

[আহ্নিক পূজার পট্টবস্ত্র পরিধানে রাজেশ্বর এসে ঠাকুর ঘরে ঢুকে স্ত্রী ও ছেলেকে দেখে ওদের দিকে বারেকের জন্য তাকালেন।—চন্দ্র বাবাকে দেখে সরে পড়ছিল, বাধা দেন রাজেশ্বর।]

রাজেশ্বর। শোন, আজ থেকে নিয়মিত তুমি আমার সঙ্গে কাছারীতে বসবে।

[করুণ মিনতিভরা দৃষ্টিতে ছেলে মার মুখের দিকে তাকালো।]

জাহ্নবী। এই তো সবে পরীক্ষা দিয়ে কলকাতা থেকে এলো। তাছাড়া ও বলছিল—

রাজেশ্বর। বলছিল! কি বলছিল—

জাহ্নবী। ও আরো পড়াশুনা করতে চায়।

রাজেশ্বর। না। বি, এ পর্যন্ত পড়েচে যথেষ্ট! ওর বাপ পিতামহদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ না ডিঙ্গিয়েও যদি চলে গিয়ে থাকে, ওরও চলে যেতো। কেবল তোমার অনুরোধেই ওকে এতদিন বাধা দিইনি। আর না। যাও। নিচে কাছারীতে গিয়ে বোস। আমি আহ্নিক সেরে আসচি।

[মাতা পুত্র ঘর ছেড়ে চলে গেল। রাজেশ্বর গিয়ে পূজার আসনে বসলো, মঞ্চ ঘুরতে থাকে।]

॥ দৃশ্য ঃ চার ॥

[যখেব জঙ্গলে পড়ো বাড়িব একটি কক্ষ। ঘরের এককোণে দীপাধারে জ্বলচে একটি প্রদীপ। ঘবেব মধ্যে অপর্ণা ও সরযূর মধ্যে কথা হচ্ছিল।]

সবযূ। সেদিন ওভাবে স্পষ্টাস্পষ্টি সূর্যকান্তব মুখের উপরে কথাটা বলে আমার মনে হয় তুমি ভাল করোনি অপর্ণা!

অপর্ণা। কেন?

সরযূ। অতর্কিতে সূর্যকান্ত যদি কোন একসময় পিছন থেকে চন্দ্রকুমারকে আঘাত করে?

অপর্ণা। পিছন থেকে অতর্কিতে আঘাত করবে?

সরযূ। হাঁ, মনে নেই তোমার, আমাব কাকাজীকে অন্ধকারে পিছন থেকে অতর্কিতে বর্শা চালিয়ে হত্যা করেছিল। অব্যর্থ ওর হাতের নিশানা তুমি তো জানো!

অপর্ণা। তা যদি করে তো সে ভুলই করবে। মিথ্যে দুঃশ্চিন্তা করিস না সরযূ! তুই শুয়ে পড়, আমিও শুতে যাই!

সরযূ। কেন জানিনা অপর্ণা! আমার মন যেন বলচে, অমঙ্গলের ছায়া ঘনিয়ে আসচে একটা—

অপর্ণা। অমঙ্গল। কিসের অমঙ্গল! আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কোন অমঙ্গলই তোকে স্পর্শ করতে পারবে না জানিস!

সরযূ। তার চাইতে চলো না কেন, এখান থেকে অন্য কোথায়ও আমরা পালিয়ে যাই।

অপর্ণা। পালিয়ে যাবো ?

সরযূ। হাঁ, দূরে অনেক দূরে অন্য কোথায়ও। কোন লোকালয়ে আর নয়, কোন নির্জন দুর্ভেদ্য জঙ্গল বা কোন মরুভূমিতে। যেখানে সূর্যকান্ত কোন দিনই আর আমাদের সন্ধান পাবে না।

অপর্ণা। না। এতকাল কেবল ভয়ে ভয়েই কাটিয়েছি, চোরের মত সত্যি পরিচয়টুকু পর্যন্ত গোপন করে এসেচি। কিন্তু আর নয়, আর পালাবো না। কেবল সূর্যকান্ত কেন, কারো ভয়েই আর পালাবো না। হাঁ, শেষ মীমাংসার সময় যদি এসেই থাকে তো, মুখোমুখি হয়েই তার দাঁড়াবো এবারে।

সরযূ। [সভয়ে] অপর্ণা !

অর্পণা। হাঁ, দেখতে চাই আমি সরযূ, ভাগ্যের শেষ অধ্যায়ে এখনো আমার জন্য কি তোলা রয়েচে। এই আত্মগোপন, এই ঘৃণিত পলায়ণবৃত্তির শেষ কোথায়। কিন্তু যাক সে কথা, তোকে যে বলেছিলাম, চন্দ্রকুমার এবারে এলে তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে, করেছিলি ?

সরযূ। না।

অপর্ণা। না কি রে !

সরযূ। ছিঃ আমার বড় লজ্জা করে।

অপর্ণা। লজ্জা ! পরিচয় জিজ্ঞাসা করবি তার মধ্যে আবার

লজ্জার কি আছে শুনি! রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এবাড়িতে আলো দেখে সে এখানে এসেছিল, তারপরই পরিচয় ও সে আসা যাওয়া করে। কিন্তু আমরা তো আজো জানি না সে কে! কি তার সত্য পরিচয়।

সরযূ। নাইবা জানলাম তার পরিচয়, কিইবা হবে জেনে?

অপর্ণা। পরিচয় জেনে কি হবে! কি বলচিস তুই সরযূ!

সরযূ। ঠিকই বলচি।

[বাইরের বন্ধ দরজায় এমন সময় টুক্‌টুক্ মৃদু শব্দ শোনা গেল। শোনা গেল চন্দ্রকুমারের চাপা কণ্ঠস্বর]

নেপথ্যে চন্দ্র: সরযূ! সরযূ!

সরযূ। চন্দ্রকুমার।

সরযূ। আমি যাচ্ছি, কিন্তু মনে থাকে যেন আমার কথাটা!

[ঘরের অন্য একটি দ্বার দিয়ে অপর্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সরযূ এবারে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই উত্তরীয়তে মুখ ঢেকে সন্তর্পণে চন্দ্রকুমার ঘরে এসে ঢুকলো। সরযূ দরজায় পুনরায় অর্গল তুলে দেয়। চন্দ্রকুমার উত্তরীয়র আবরণ মুখ থেকে সরিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সরযূর মুখের দিকে। অপূর্ব ছাঁদে কবরী বন্ধন করেছে আজ সরযূ। খোপা নয় মুক্ত বেণী, বুকের 'পরে নেমে এসেচে। কপালে কাঁচ পোকার টিপ মেঘ ডম্বুর শাড়ী!]

সরযূ। কি হলো! অমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন?

[এগিয়ে এসে চন্দ্রকুমার সরযূর লম্বমান বেণীটা হাতে তুলে নিয়ে বলে]

চন্দ্র। মেঘবরণ কন্যা, সাপের মত বেণী! এমনি করেই তুমি রোজ কেশ রচনা করো সরযূ!

সরযূ। [মৃদু হেসে] কেন বলতো!

চন্দ্র। দাঁড়াও। দাঁড়াও—

[বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে দীপাধার থেকে প্রদীপটি হাতে তুলে এনে প্রজ্জ্বলিত দীপটি সরযূর মুখের সামনে ধরে বলে।]

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধূ ঐখানে থাকো,
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখো—

সরযূ!—

[বলতে বলতে মাথার অবগুণ্ঠন তুলে দেয় সরযূর চন্দ্র প্রদীপটি নামিয়ে রেখে]

সরযূ। বলো।

চন্দ্র। কেবলই কি আমার মনে হয় জানো সরযূ!

সরযূ। কি!

চন্দ্র। মনে হয় যেন অনেক, অনেক দূরের তুমি, নাগালের বাইরে। কোন মন্ত্র পড়েই তোমাকে ঘরে নিয়ে আটকে রাখা চলবে না। কোন বন্ধনেই বুঝি তোমাকে বাঁধা যাবে না কোনদিন!

সরযূ। ও সব কি কথা!

চন্দ্র। হাঁ, সরযূ! মনে হয় যেন তুমি শুধু স্বপ্নই। রাত্রির একটি মধুর স্বপ্ন। ঘুম ভাঙলেই যে স্বপ্ন পালিয়ে যাবে নাগালের বাইরে—

[বলতে বলতে দু'হাতে চন্দ্রকুমার সরযূকে কাছে টেনে নেয়]

সরযূ। কি করো, কি করো।

চন্দ্র। কি হলো।

সরযূ। দেখছো না চেয়ে আছে যে!

চন্দ্র। কে! কোথায়!

সরযূ। [হাত দিয়ে প্রদীপ শিখার দিকে] ঐ যে —

চন্দ্র। [মৃদু হেসে] ও! তাইতো।

[চন্দ্র এবারে এগিয়ে গিয়ে ফুঁ দিয়ে প্রদীপটি নিবিয়ে দিয়ে ঘরের জানলাটা খুলে দিল। এক ঝলক চাঁদের আলো এসে ঘরের মধ্যে মৃদু আলোছায়া রচনা করে।]

সরযূ। বাঃ কি সুন্দর চাঁদের আলো!

[চন্দ্র কাছে এগিয়ে আসে আবার সরযূর।]

চন্দ্র। সরযূ!

সরযূ। উঃ

চন্দ্র। ঘুম পাচ্ছে বুঝি?

সরযূ। না তো!

চন্দ্র। তবে চুপ করে আছো যে!

সরযূ। তুমি বল আমি শুনি!

চন্দ্র। আচ্ছা সরযূ, এমনি করে যদি রাত্রিই কেবল আমাদের সামনে থাকতো অনন্তকাল ধরে তার কালো পক্ষ বিস্তার করে। এমনি নিবিড় পাওয়ার মধ্যে দিয়েই সময় তার চলা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতো।

সরযূ। কি সব বলছ তুমি, আমার বড্ড ভয় করছে।

চন্দ্র। আচ্ছা সরযূ, এমন যদি কিছু হয়, আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়—

সরযূ। [সহসা দু'হাতে চন্দ্রকে ধরে] না, না—ও কথা বলো না। বলো না।

চন্দ্র। ছিঃ তুমি বড ভীতু সরযূ! বড কোমল, বড বিশ্বাসী। কিন্তু জগৎটাতো তা নয়। বড় কঠিন, বড কর্কশ, অবিশ্বাস আর সন্দেহ, দুঃখ আর বেদনা, মিথ্যা আর জবরদস্তি—

সরযূ। না, তবু কেউ আমাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না, তার আগে জেনো আমি—

[বলতে বলতে চকিতে সরযূ কোমর থেকে শাদা বাঁটের একটা চক্‌চকে ছোরা টেনে বের করে।]

চন্দ্র। ও কি।

সরযূ। হাঁ, তার আগেই জেনো এই ছোরা আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে। মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করলেও এ করবে না কোনদিন।

[ছোরাটা আবার সরযূ কোমরে গুঁজে রাখে।]

চন্দ্র। ছোরাটা সব সময়েই কোমরে গুঁজে রাখ নাকি

সরযূ। হাঁ।

চন্দ্র। কিন্তু কেন!

সরযূ। বললাম তো, আজকাল তো দ্রৌপদীদের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে ভগবানের আবির্ভাব হয় না, তাই—

চন্দ্র। তাই যেন তুমি পার সরযূ। তাই যেন পারো।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবার আগে চকিতে সূর্যকান্তের মুখটা জানালা পথে দেখা যায়।]

সরযূ। [চিৎকার করে] কে! কে!

॥ মঞ্চ ঘরে যাবে ॥

॥ দৃশ্য ঃ পাঁচ ॥

[কাল ঃ রাত্রি। রাজেশ্বর চৌধুরীর কাছারী ঘর। চৌকীতে ফরাস পাতা। দেওয়ালে ঢাল তরোয়াল। দেওয়ালে দু'দিকে দেওয়ালগিরি জ্বলছে। বাঘের মতই ক্রুদ্ধ রাজেশ্বর অস্থির পদে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেন। দেওয়ালের গায়ে একটা জানালা দেখা যাচ্ছে, ও পাশে গাছপালা, অন্ধকারে সেই গাছপালায় জোনাকীর আলো। দেওয়ালে ঝোলানো চৌধুরীদের পূর্বপুরুষদের সব প্রতিকৃতি। সামনে দাঁড়িয়ে পাইক সর্দার বৃদ্ধ মাধব। মাধবের বয়েস হলেও বলিষ্ঠ সুগঠিত চেহারা। মালকোছা এঁটে কাপড় পরা, মাথায় ঝাকড়া চুল কাচা পাকা।]

রাজেশ্বর। অপদার্থ! অপদার্থ সব। এতদিন হয়ে গেল আজ পর্যন্ত একটা খবর করতে পারলি না। যা। যা—। আমার সামনে থেকে সরে যা! না পারিস চাকরি ছেড়ে দে, যা—

মাধব। [নম্রকণ্ঠে] কি করব বলুন হুজুর। রোজ রাত্রে যেই তিনি ঘোড়ায় চেপে বের হন আমিও তাঁর পিছু নিই। কিন্তু চোখের পলকে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে কোন পথে, কোন দিকে যে দাদাবাবু মিলিয়ে যান—

রাজেশ্বর। থাম! থাম—আমার ইচ্ছা করচে কি জানিস, তোর বুকের উপর দিয়ে আমিই ঘোড়া ছুটিয়ে যাই।

[সহসা এমন সময় জানালা পথে একটি মানুষের মুখ দেখা যায়। রাজেশ্বর চৌধুরীর সেদিকে নজর পড়তেই এক লাফে জানালার দিকে এগিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন।]

কে! কে ওখানে। রঘুনন্দন, বাইরে কে দেখতো, মাধব যাতো—

[মাধব বের হয়ে গেল, রাজেশ্বর ঘরের মধ্যে আবার পায়চারী করেন। একটু পরেই শীর্ণকায়, মাথায় ঝাকড়া চুল, গলায় উপবীত, একজনকে তার গলার উত্তরীয়টা গলায় পেঁচিয়ে টানতে টানতে এনে রঘুনন্দন ঘরে ঢুকলো, পশ্চাতে মাধবও এলো।]

রঘুনন্দন। আপনি বলার আগেই ওকে দেখতে পেয়ে ধরে ফেলেছিলাম হুজুর—

রাজেশ্বর। [আগন্তুকের দিকে চেয়ে] কে তুই!

নিশাকর। আ—আজ্ঞে—আ—আমি হুজুর, আ—আপনার দাস!

মাধব। ওকে আমি চিনি হুজুর, ওর নাম নিশাকর তর্কচঞ্চু হুজুর।

নিশাকর। নিশাকর তর্কচঞ্চু হুজুর।

রাজেশ্বর। নিশাকর তর্কচঞ্চু! কে এ লোকটা মাধব! কোথায় থাকে!

মাবব। আজ্ঞে আপনারই প্রজা, ময়নার চরে থাকে!

নিশাকর। আজ্ঞে আপনারই প্রজা।

রাজেশ্বর। হুঁ! তা বাইরে থেকে লুকিয়ে আমার ঘরে উঁকি দিচ্ছিলি কেন?

নিশাকর। আজ্ঞে শিখিয়ে দিয়েচে—

রাজেশ্বর। শিখিয়ে দিয়েচে!

নিশাকর। আজ্ঞে পাঠিয়ে দিয়েচে—

রাজেশ্বর। শিখিয়ে দিয়েচে, পাঠিয়ে দিয়েচে, সত্যি কথা বল্ হারামজাদা! নইলে এখুনি দু'টুকরো করে কেটে ফেলবো!

নিশাকর। [কেঁদে] দোহাই হুজুর। স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে তাহলে একেবারে মারা যাবো।

রাজেশ্বর। নিয়ে আয়তো মাধব পাশের ঘর থেকে চাবুকটা আমার।

নিশাকর। না, না—হুজুর বলচি, বলচি—

রাজেশ্বর। বল।

নিশাকর। [একবার মাধব ও একবার রঘুনন্দনের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল] আজ্ঞে কথাটা একটু নিরিবিলি হলে—

রাজেশ্বর। মাধব, রঘুনন্দন!

[নিঃশব্দে মাধব ও রঘুনন্দন ঘর থেকে বের হয়ে গেল।]

বল, এবারে কি বলছিলি ?

নিশাকর। আজ্ঞে হুজুর আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ! গরীব ব্রাহ্মণ শুধু পয়সার লোভে—

রাজেশ্বর। বল কি বলবি!

নিশাকর। আজ্ঞে অভয় দিচ্ছেন তো।

রাজেশ্বর। হাঁ, হাঁ—বল!

নিশাকর। দেখবেন হুজুর, গরীব ব্রাহ্মণের পৈতৃক প্রাণটা—

রাজেশ্বর। [বাঘের মতো গর্জে] নিশাকর।

নিশাকর। আজ্ঞে, এই—এই বলচি! [ঢোক গিলে] বলছিলাম আপনার ছেলে চন্দ্রকুমার—

রাজেশ্বর। [চমকে] কি! কি বললি ?

নিশাকর। আজ্ঞে বলছিলাম আপনার ছেলে চন্দ্রকুমার এক অজ্ঞাত কুলশীলা—

রাজেশ্বর। [গর্জে ওঠে] নিশাকর!

নিশাকর। অধীনের অপরাধ নেবেন না হুজুর। যখের জঙ্গলের ধারে মহিম আচার্য নামে যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করতো তারই বাড়িতে কয়েক মাস যাবৎ দু'টি স্ত্রীলোক এসে বসবাস করচে—

রাজেশ্বর। [অধৈর্যে] কে ! কারা তারা ?

নিশাকর। আমি ! আমি—সব জানি না হুজুর। তবে এইটুকুই জানি তারা বিদেশিনী, রাজপুতানী—

রাজেশ্বর। [বিস্ময়ে] বিদেশিনী ! রাজপুতানী।

নিশাকর। আজ্ঞে। তাদের মধ্যে একজন বর্ষিয়সী, অন্যজন কিশোরী। অপরূপ সুন্দরী সেই কিশোরী, নাম শুনেচি তার সরযু ! আর ঐ দ্বিতীয় জন বোধ হয় ওর দাসী,—

রাজেশ্বর। কেমন করে জানলি এ সব কথা।

নিশাকর। দেখেচি এক রাত্রে, আর সূর্যকান্ত বলেচে আমাকে।

রাজেশ্বর। সূর্যকান্ত ! কে সে ?

নিশাকর। তা জানি না হুজুর। সেই একরাত্রে আমাকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেখায়। তারপর দশটা টাকা দিয়ে আমাকে বলে খবরটা আপনাকে দিতে। খবরটা আপনাকে দিতে পারলে আরো দশ টাকা দেবে বলেচে। দোহাই হুজুরের আমি নির্দোষ।

রাজেশ্বর। হুঁ ! কিন্তু চন্দ্রকুমারের কথা কি বলছিলি ?

নিশাকর। আজ্ঞে তাকে ঐ রাত্রে ঐ সরযু মেয়েটির সঙ্গে তার ঘরে বসে কথা বলতে দেখেচি।

রাজেশ্বর। ঠিক দেখেচিস !

নিশাকর। আজ্ঞে চোখে একটু কম দেখি বটে তবে সূর্যকান্ত বললে—

রাজেশ্বর। হুঁ! চন্দ্রর নিশীথ অভিযান তাহলে প্রতি রাত্রে ঐ সরযূরই ঘরে! [একটু থেমে] রঘুনন্দন!

[মুহূর্তে রঘুনন্দন যেন লাফিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।]

রঘু। হুজুর।

রাজেশ্বর। তোর ঐ সূর্যকান্ত কোথায় থাকে!

নিশাকর। তাতো জানিনা হুজুর! বোধ হয় যখের জঙ্গলের মধ্যেই।

রাজেশ্বর। হুঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। মাধব!

[মুহূর্তে মাধব এসে ঘরে প্রবেশ করলো।]

আমার ঘোড়া।

[মাধব বের হয়ে গেল চকিতে]

রঘু এটাকে নিয়ে যা, আমার পাতাল ঘরে।

নিশাকর। [কেঁদে] হুজুর! মা বাপ!

[রঘুনন্দন এসে নিশাকরের একখানা হাত চেপে ধরে]

রাজেশ্বর। অনেক কিছুই দেখচি তুই দেখে ফেলেচিস নিশাকর। এ অবস্থায় তোকে কি আমি পাতাল ঘর ছাড়া আর অন্য কোথাও যেতে দিতে পারি—

[বলতে বলতে রাজেশ্বর এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে ঝোলান একটা বড় লোহার চাবি পেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় রঘুর দিকে, রঘুনন্দনও অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় চাবিটা হাতে লুফে নেয়।]

নিশাকর। হুজুর অভয় দিয়েছিলেন।

রাজেশ্বর। দিয়েছিলাম। কিন্তু নিশাকর, তোর ঐ প্রাণটার

চাইতেও ঢের বেশি মূল্য যে চৌধুরীবংশের ইজ্জতের। রঘুনন্দন—

[রঘু প্রভুর ডাকে নিশাকরকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে]

রঘুনন্দন। চল—

নিশাকর। দয়া করুন, দয়া করুন হুজুর—

রাজেশ্বর। বললাম তো নিশাকর, তোর ঐ জিহ্বা আজ যেমন আমার সামনে অর্থের লোভে একটু আগে নড়ে উঠেছিল, তেমনি আবার কখনো নড়ে উঠে, ভবিষ্যতে চৌধুরীবাড়ির এত কালের ইজ্জতের গায়ে কালি না লাগাতে পারে তাই তোর ঐ জিহ্বার চাইতেও ঢের বেশি শক্তিশালী এক জোড়া বিষাক্ত জিহ্বাব মুখে তোকে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছি—

নিশাকর। [কেঁদে] হুজুর—

রাজেশ্বর। যা। পাতাল ঘরে আছে আমার ক্ষুধার্ত একজোড়া পাহাড়ী অজগর—তোর চাইতেও লোভী।

নিশাকর। হুজুর—মা বাপ, দয়া—দয়া করুন, আপনার এ তল্লাট ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যাবো, আর জীবনে কখনো মুখ দেখতে পাবেন না।

রাজেশ্বর। আমিও তো তাই চাই! কেবল আমার এ তল্লাট নয়, এ ছুনিয়ার কোথায়ও কোনদিন যাতে আর তুই মুখ দেখাতে না পারিস, তাই এই ব্যবস্থা। বিষে বিষক্ষয়......হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাসি হেসে ওঠেন রাজেশ্বর। রঘুনন্দন টানতে টানতে নিশাকরকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, পাগলের মত হাসতে থাকেন রাজেশ্বর চৌধুরী। যবনিকা নেমে আসে ধীরে ধীরে।]

—যবনিকা—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

॥ দৃশ্য : এক ॥

[রাত্রি মধ্যযাম। অপর্ণার কক্ষ। এককোণে টিম্ টিম্ করে প্রদীপদানে প্রদীপ জ্বলচে। ভূশয্যায় নিদ্রাভিভূত অপর্ণা! ঘরের দরজা বন্ধ। একটি মাত্র জানালা তাও বন্ধ! এক সময় দেখা গেল সেই বন্ধ জানালার কবাটের মধ্য দিয়ে সুতীক্ষ্ণ একটা বর্শার ফলা ঘরের মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ করচে। ক্রমে তারই চাপে জানালার কবাট খুলে গেল। জানালার গরাদের ওপাশে দেখা গেল, অর্ধেক কাপড়ে ঢাকা রাজেশ্বর চৌধুরীর মুখ। দুটি চক্ষুর মণি যেন সাপের চোখের মত জ্বলচে। বলিষ্ঠ হাত দিয়ে রাজেশ্বর জানালার গরাদ বেঁকিয়ে সেই জানালা পথে বর্শা হাতে, টপকে ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর এদিক ওদিক দেখে নিদ্রিতা অপর্ণার সামনে এসে দাঁড়ালেন— প্রদীপ শিখাটা একটু উসকে দিয়ে ধীরে ধীরে হাতের বর্শাটা ঘুমন্ত অপর্ণার বুকের উপরে চেপে ধরতেই, অপর্ণার ঘুম ভেঙে গেল, সে তাকালো।]

অপর্ণা। কে! কে?—

রাজেশ্বর। [চাপা কণ্ঠে] চুপ আস্তে! চেঁচিয়েচো কি দেখচো এই বর্শা, সবটা গলার মধ্যে বসিয়ে দেবো।

অপর্ণা। কে! কে তুমি? [উঠে বসে অপর্ণা]

রাজেশ্বর। ওঠো! উঠে দাঁড়াও—

[অপর্ণা উঠে দাঁড়ায় সামনা সামনি রাজেশ্বরের মুখের দিয়ে চেয়ে। নির্বাক সে চেয়ে থাকে রাজেশ্বরের দিকে।]

অপর্ণা। আপনি—

রাজেশ্বর। আগে যা জিজ্ঞাসা করচি তার সত্য জবাব দাও, মিথ্যা বললে এ বর্শা চালিয়ে মাটির সঙ্গে পুঁতে রেখে যাবো!

অপর্ণা। কি!

রাজেশ্বর। বল, প্রত্যহ রাত্রে চন্দ্রকুমার এখানে আসে কিনা!

অপর্ণা। [রাজেশ্বরের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে] তুমি!

রাজেশ্বর। কে! তুমি, তুমি আমাকে চেনো?

[মৃদু হেসে অপর্ণা এবারে এগিয়ে গিয়ে প্রদীপদান থেকে প্রদীপটি তুলে এনে নিজের মুখের সামনে ধরে বলে]

অপর্ণা। দেখতো, চিনতে পারছো কি না আমায়।

রাজেশ্বর। [বিস্ময়ে] তুমি!—

অপর্ণা। মনে করতে পারচে না। তা ভুলে যাবারই কথা। তা ছাড়া তোমার হয়ত ধারণা—

রাজেশ্বর। কে অপর্ণা!—

অপর্ণা। [প্রদীপটা নামিয়ে রেখে] পেরেচো, চিনতে তাহলে পেরেচো। হাঁ—আমি অপর্ণাই!

রাজেশ্বর। অপর্ণা! তুমি! তুমি—তাহ'লে আজো, আজো বেঁচে আছো!

অপর্ণা। হাঁ আছি! খুব আশ্চর্য লাগচে না রাজা রাজেশ্বর চৌধুরী!

রাজেশ্বর। আমি! আমি—না, না—অপর্ণা!

অপর্ণা। হুঁ! তাই প্রথম দিন চন্দ্রকুমারের মুখ দেখে চমকে

উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন তার সেই মুখখানি চেনা, আমার অনেক অনেক দিনের চেনা—। তাহলে চন্দ্রকুমার—

রাজেশ্বর। হাঁ, আমারই একমাত্র ছেলে। কিন্তু তুমি

অপর্ণা। কি আমি—

রাজেশ্বর। আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, আজো তুমি—

অপর্ণা। কেমন করে বেঁচে আছি, তাই না!

রাজেশ্বর। হাঁ, মানে—

অপর্ণা। বেঁচে যে আজো আছি তাতো দেখতেই পাচ্ছো। এ অপর্ণার প্রেত নয়, ছায়াও নয়, সত্যি সত্যিই রক্তমাংসের অপর্ণা! বিস্ময়। তবুও অপর্ণা আজও বেঁচেই আছে। রাজা জগৎনারায়ণ চৌধুরী, তোমার বাবা, রত্নেশ্বর সিংয়ের ঘরে আগুন দিয়ে, বাপ ও তার মেয়েকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল সত্য, কিন্তু রাজেশ্বর, দেখতেই পাচ্ছো, রত্নেশ্বর সিং সে রাত্রে পুড়ে মরলেও তার মেয়ে অপর্ণা সেদিন মরেনি। খুব আশ্চর্য লাগছে না!

রাজেশ্বর। অপর্ণা!

অপর্ণা। কি!

রাজেশ্বর। তুমি—তুমি—

অপর্ণা! হাঁ, হাঁ—আজ আমার প্রতিশোধ নেবার পালা!

রাজেশ্বর। প্রতিশোধ!

অপর্ণা। নেবো না! সম্পূর্ণ নিরপরাধ রত্নেশ্বর সিংকে তোমার বাবা সেদিন ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিলেন। সে

অপমান, সে লাঞ্ছনা, সে অত্যাচারের প্রতিশোধ, তার মেয়ে হয়ে আমি নেবো না? নিশ্চয়ই নেবো।

রাজেশ্বব। অপর্ণা!

অপর্ণা। পাগলের মত এই নিশি রাত্রে কেন তুমি আমার এখানে ছুটে এসেছো তাকি আমি বুঝতে পারচি না ভেবেচো। কিন্তু তা আজ আর হবে না। রাজেশ্বর চৌধুরী, তা আজ আর—হবে না।

রাজেশ্বব। অপর্ণা! অপর্ণা—

অপর্ণা। কি ভয় পাচ্ছো আজ রাজেশ্বর চৌধুরী! কিন্তু বলতে পারো সেদিন এক গরীব গৃহস্থ তোমাদেরই আশ্রিত বাজপুত ও তার কুমাবী কন্যা কি এমন অপরাধ করেছিল তোমাদের কাছে যাব জন্য তোমরা তাদের ঘরে আগুন দিয়ে—

রাজেশ্বর। ভুলে যাও, আজ সে কথা ভুলে যাও অপর্ণা।

অপর্ণা। ভুলে যাবো! দীর্ঘ চব্বিশটা বছর ধরে অপমানের দুঃসহ জ্বালা এই বুকের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছি, এত সহজে কি তা ভোলা যায় ঐ ছোট্ট একটা অনুরোধের খাতিরে।

রাজেশ্বর। অপর্ণা—

অপর্ণা। না—না। তা আজ আর হয় না। চব্বিশ বছর আগে যে আগুন দিয়ে এক নিরপরাধিনী কিশোরীর সুখের ঘর তোমরা পুড়িয়েছিলে, সেই, সেই আগুন দিয়েই আজ পোড়াব তোমার সুখের ঘর। তোমাদের চৌধুরী বাড়ির ভুয়ো ই··ত।

[বলতে বলতে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের হাসি হাসে অপর্ণা]।

চন্দ্রকুমারকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেচো, তাই না! কিন্তু তাকে তুমি পাবে না। শুনচো, পাবে না। ফিরিয়ে আমি দেবো না।

রাজেশ্বর। দেবে না?

অপর্ণা। না।

রাজেশ্বর। তাহলে এই তোমার শেষ কথা অপর্ণা!

অপর্ণা। [অধীব কণ্ঠে] হাঁ, হাঁ—শেষ কথা। পাবে না। পাবে না।

রাজেশ্বর। তাহলে বলবো, তুমিও ভুল করচো অপর্ণা!

অপর্ণা। ভুল।

রাজেশ্বব। হাঁ, ভুল। কারণ আজ তোমার সামনে যে দাঁড়িয়ে সে অতীতের ভীরু প্রেমে অন্ধ বাজেশ্বর চৌধুরী নয়।

অপর্ণা। তাই নাকি।

রাজেশ্বর। হাঁ, আজ সে সেই ঘরে আগুন দেওয়া জগৎনারায়ণ চৌধুবীরই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিভূ। সেদিন জগৎনাবায়ণ যেমন করে রাজেশ্বর চৌধুরীকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আজকের রাজেশ্বর ঠিক তেমনি করেই চন্দ্রকুমারকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। এটা আমারই এলাকা—

অপর্ণা। হতে পারে। কিন্তু চন্দ্রকুমার পা দিয়েচে আমারই এলাকায়। কিশোরী, লাজুক অপর্ণাকে সেদিন তোমরা দেখেছিলে রাজেশ্বর চৌধুরী, কিন্তু দেখোনি বাঘিনী আজকের অপর্ণাকে।

রাজেশ্বর। [মৃদু দন্তের হাসি হেসে] বাঘিনী। বাচ্চা সমেত বাঘিনীকে আমার পাইকদের দিয়ে নিয়ে গিয়ে আটক করবো আমার পাতাল ঘরে। সেখানে আছে ক্ষুধার্ত একজোড়া পাহাড়ী অজগর। তিল তিল করে তোমরা মায়ে ঝিয়ে প্রাণ দেবে বিষাক্ত সেই অজগরের নির্মম মৃত্যু আবেষ্টনীর মধ্যে—

অপর্ণা। স্বচ্ছন্দে। স্বচ্ছন্দে নিয়ে গিয়ে তুলতে পারো, যেখানে তোমার খুশি রাজেশ্বর চৌধুরী, তোমার একমাত্র পুত্র-বধূকে—

রাজেশ্বর। [চীৎকার করে] কি ? কি বললে ?

অপর্ণা। [মৃদু হেসে] হাঁ, রাজেশ্বর চৌধুরী, আজ সরযূ তোমার একমাত্র বংশধর পুত্র চন্দ্রকুমারেরই বিবাহিতা স্ত্রী।

রাজেশ্বর। [চিৎকার করে] মিথ্যা ! মিথ্যা ষড়যন্ত্র ! বিশ্বাস করি না আমি, বিশ্বাস করি না।

অপর্ণা। কিছুমাত্র যাবে আসবে না তাতে। অগ্নি, নারায়ণ শীলা, পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেই চন্দ্রকুমার তাকে স্ত্রীর, সহধর্মিণীর স্বীকৃতি দিয়েছে। তাছাড়া এও জেনে রাখো, চন্দ্রকুমার তাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে।

রাজেশ্বর। ভালবাসে ! ভালবাসে। হাঃ হাঃ হাঃ—

অপর্ণা। হাসো, হাসো রাজেশ্বর চৌধুরী ! প্রাণ খুলে হাসো। তবু জেনো, জগৎশুদ্ধ লোকের কণ্ঠরোধ তুমি করতে পারো কিন্তু সে ভালবাসার কণ্ঠরোধ করবার মত শক্তি তোমার নেই। নেই—

বাজেশ্বর। [হাসচেন তখনও] হাঃ হাঃ হা;।

অপর্ণা। শোন, শোন—এখনো শেষ হয়নি। জানো কি রাজেশ্বব চৌধুরী, তোমার একমাত্র পুত্রের বধূ, চৌধুরী বাড়ির ভাবী বধূবাণীব জন্মপরিচয়টা। নামগোত্র হীনা—

রাজেশ্বব। কি? কি বললে?

অপর্ণা। [নিষ্ঠুর হেসে] হাঁ, নামগোত্র পরিচয় হীনা, অজ্ঞাত কুল-শীলা! এবাবে বুঝতে পারচো রাজেশ্বর চৌধুরী, রত্নেশ্বর সিংয়েব ঘরে লাগানো সেদিনকার তোমাদেরই হাতের আগুন, কেমন করে এতকাল পরেও তোমাদের চৌধুরী বাড়ির ইজ্জতের গায়ে—

বাজেশ্বর। না, না—বিশ্বাস করি না আমি, মিথ্যা, সব কথা তোমাব মিথ্যা—। সবযূ নিশ্চয়ই তোমারই মেয়ে।

অপর্ণা। [হেসে] হায় বে জগৎনারায়ণের বংশধর! শুনেও হাসি পাচ্ছে। একদিন মার ঘরে শুধুমাত্র ঐ বংশ পরিচয়ের অপরাধে আগুন দিতে দ্বিধা করোনি, আজ তারই বংশ-মর্যাদাকে শেষ আশ্রয়ের কুটো করে ভেসে উঠতে চাও। কিন্তু না, সে সান্ত্বনাটুকুও আজ তোমার নেই। সরযূ আমার মেয়ে নয়। পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া, কন্যাস্নেহে পালিতা মাত্র। আর সে কথা তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ দু'জনেই জানে। জেনেই সে বিবাহ করেছে।

রাজেশ্বর। না, না—এ হতে পারে না, হতে পারে না। এত বড় আঘাত তুমি আমাকে দিতে পারো না। অপর্ণা, বলো, বলো – বলো সত্যি কথা বলো, করজোড়ে আজ

তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো—

অপর্ণা। ক্ষমা! আশ্চর্য। ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। ঠিক আজকের মত এমনি করেই জগৎনারায়ণ চৌধুরীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছিল অপর্ণার হতভাগ্য বাবা! কিন্তু রাজসিক আকাশ প্রমাণ দম্ভ সেদিন তার সে কান্না শুনতে পায় নি! না রাজেশ্বর, অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। অপর্ণা আজ বধির। বধির।

রাজেশ্বর। শুনবে না, শুনবে না তাহলে তুমি অপর্ণা?

অপর্ণা। না, না—

রাজেশ্বর। অপর্ণা!

অপর্ণা। না। না—না।

রাজেশ্বর। সত্যিই তাহলে আজ তুমি আমাকে ফিরিয়েই দেবে!

অপর্ণা। হাঁ—হাঁ—ফিরেই তোমাকে আজ যেতে হবে রাজেশ্বর।

রাজেশ্বর। বেশ। তাই হোক—

[আর একটি বাক্যও উচ্চারণ না করে রাজেশ্বর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মঞ্চ ঘুরে যাবে।]

॥ দৃশ্য ঃ দুই ॥

[ঐ বাড়িতেই সরযূর ঘর। সরযূ আর চন্দ্রকুমার কথা বলচে। ঘরে প্রদীপ জ্বালা।]

চন্দ্র। অমন করে আর চুপ করে থেকো না সরযূ, জবাব দাও। বললাম তো তোমাকে, নাইবা থাকলো তোমার কোন জন্ম-পরিচয়। আমাদের পবস্পরের ভালবাসাই কি যথেষ্ট নয়? তার উপরেও কি তুমি বিশ্বাস রাখতে পারচো না সরযূ!

সরযূ। না। না—

চন্দ্র। তাহ'লে শূন্য হাতেই আমি ফিরে যাবো সরযূ! বলো? বলো—

সরযূ। [কান্নাঝরা স্বরে] না গো না! অমন করে আর বলো না গো। অমন করে আব বলো না।

চন্দ্র। সবযূ!

সরযূ। না, না—কেন, কেন তুমি বুঝতে পারছো না, তোমাব সমাজ আছে, আত্মীয় আছে, স্বজন আছে—

চন্দ্র। সমাজ, স্বজন, আত্মীয়। চাই না, চাই না আমি কিছু। যে সমাজ এত বড় ভালবাসার মূল্য দেয় না, সে সমাজ আমার চাই না। চলে যাবো সে সমাজ ছেড়ে। নতুন করে আমরা আমাদের সমাজ গড়বো। বল, বল সরযূ, তুমি রাজী আছো!

[বন্ধ দরজায় এমন সময় করাঘাত শোনা গেল।]

নেপথ্যে অপর্ণা। সরযূ! সরযূ—

সরযূ। অপর্ণা!

[চন্দ্র সরে দাঁড়ায়। সরযূ গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অপর্ণা এসে ঘরে ঢুকলো।]

অপর্ণা। সরযূ! চন্দ্রকুমার!

[দু'জনেই বিস্ময়ে অপর্ণার মুখের দিকে তাকায়।]

দরজার ওপাশ থেকে একটু আগেই তোমাদের সব কথাই আমি শুনেচি। সত্যিই কি তুমি সরযূকে ভালবাসো চন্দ্রকুমার?

[চন্দ্রকুমার একবার সরযূর একবার অপর্ণার মুখের দিকে চায়।]

বলো চন্দ্রকুমার, আমার কথার জবাব দাও।

চন্দ্র। আজো কি তোমাকে সে কথা বুঝিয়ে বলতে হবে অপর্ণা!

অপর্ণা। পারবে, পারবে ওকে বাঁচাতে যদি আসে জীবনে চরম দুঃখ, অভিশাপ। জান তো সরযূর কোন জন্মপরিচয় নেই—

চন্দ্র। তবু—তবু—পারবো—

সরযূ। অপর্ণা! অপর্ণা—

অপর্ণা। [সরযূর ডাকে সাড়া না দিয়ে] স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে ওকে, পারবে ওকে ওর যোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠা দিতে?

চন্দ্র। পারবো, পারবো—

সরযূ। না, না—অপর্ণা, এ অসম্ভব, অসম্ভব—

অপর্ণা। বেশ, তবে ঐ প্রদীপের অগ্নিশিখাকে সাক্ষী রেখে, এই রাত্রির দেবতাকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করো—

চন্দ্র। বলো!

অপর্ণা। বলো চৌধুরী বংশের বধূরাণীর মর্যাদায় তুমি ওকে জীবনে মরণে রক্ষা করবে।

চন্দ্র। রক্ষা করবো, শপথ করছি।

সরযূ। কুমার! কুমার—

অপর্ণা। বেশ, তবে আজ রাত্রেই তোমাদের বিবাহ হবে।

চন্দ্র। অপর্ণা! অপর্ণা!—

অপর্ণা। হাঁ, যাও। রাত্রির দুই প্রহর এখনো বাকি! যেখান থেকে পারো এখুনি গিয়ে একজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসো, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমাদের বিবাহ দেবো।

চন্দ্র। আনছি, আমি এখুনি আনছি ব্রাহ্মণ—

[দ্রুত চন্দ্রকুমার ঘর থেকে বের হয়ে গেল।]

সরযূ। কুমার, শোন—শোন! দাঁড়াও—ওকে ডাকো, ডাকো অপর্ণা! ফেরাও ওকে, ফেরাও।

অপর্ণা। [দৃঢ়কণ্ঠে] না।

সরযূ। না, না অপর্ণা, বুঝতে পারছো না তুমি। এ হতে পারে না, অসম্ভব—

অপর্ণা। পোড়ারমুখী, তুই কি ভুলে গেলি, তুই ওকে কতখানি ভালবাসিস। তবে কেন এত বড় সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিবি? কেন মিথ্যে দম্ভে মরবি?

সরযূ। তাই। তাই—দগ্ধাবো, তবু এ হতে দেবো না, কিছুতেই না।

[সরযূ কাঁদতে শুরু করে]

অপর্ণা। সরযূ। সরযূ, শোন, শোন—

সরযূ। না, না—কি আমার পরিচয়, কে আমি, নামগোত্রহীনা।

অপর্ণা। শোন সরযূ, এতদিন তোকে আমি বলিনি, তোর জন্ম-পরিচয় হেয় নয়। কোন কলঙ্ক, কোন লজ্জাই নেই তোর জন্মপরিচয়ের মধ্যে।

সরযূ। [চমকে] কি বলছো, এ সব কি বলছো তুমি!

অপর্ণা। হাঁ!

সরযূ। জন্মপরিচয় হীনা আমি নই, নামগোত্রহীনা নই আমি?

অপর্ণা। না।

সরযূ। তবে! এতদিন এ কথা আমাকে বলোনি কেন? অপর্ণা, বলো, বলো—কে আমার বাবা, কে আমার মা, কি তাদের পরিচয়? তারা জীবিত, না মৃত?

অপর্ণা। ব্যস্ত হোস নি, শোন। বলবো, সব বলবো, সব জানতে পারবি তুই, কিন্তু এখন নয়।

সরযূ। এখন নয়?

অপর্ণা। না। বিশ্বাস কর তুই আমাকে, সময় হলে সবই তুই জানতে পারবি। আর শুধু তাই নয়, একথা যে তুই আমার কাছে শুনেছিস, এখন চন্দ্রকুমারকেও তুই জানাতে পারবি না।

সরযূ। কি বলচো তুমি অপর্ণা!

অপর্ণা। হাঁ, আমি দেখতে চাই ও সত্যি তোকে কতখানি ভাল-বাসে। সত্যি সে কতটা ত্যাগ করতে পারে।

সরযূ। কিন্তু কেন, কেন বলতে পারবো না তাকে এখন সব কথা তাও বলবে না।

অপর্ণা। বললাম তো, বিশ্বাস কর তুই আমাকে, আমার কথা শোন। বিয়েতে অমত করিস নি। বিশ্বাস কর, তোর মঙ্গলই আমি চাই।

সরযূ। তুমি যা বলচো অপর্ণা, সব সত্যি ? বল, বলো—

অপর্ণা। হ্যাঁ রে হ্যাঁ! আজ তোকে তাহলে বলি, মাস আষ্টেক আগে হঠাৎ আমি তোকে নিয়ে এখানে এসে পড়ি নি। এখানে আসবো বলেই তোকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিলাম।

সরযূ। অপর্ণা!

অপর্ণা। হাঁ, কিন্তু সেদিন সে আসার পিছনে ছিল একটা উদ্দেশ্য।

সরযূ। উদ্দেশ্য!

অপর্ণা। হাঁ, একটা প্রতিশোধ! কিন্তু তা আর হলো না।...মাঝ-খান থেকে চন্দ্রকুমার এসে সব ওলোট পালোট করে দিল। ভুলে গেলাম, এতদিনের জিইয়ে রাখা প্রতিহিংসার আগুনটা যেন সহসা দপ্ করে নিভে গেল।

[সহসা এমন সময় দরজা ঠেলে সূর্যকান্ত এসে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে চমকে অপর্ণা বলে।]

এ কি! সূর্যকান্ত!

সূর্যকান্ত। হাঁ, সূর্যকান্ত।

অপর্ণা। আবার তুমি এখানে এসেছো!

সূর্যকান্ত। দেখতেই পাচ্ছো এসেছি।

[সরযূ ঐ সময় নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল।]

শুধু এসেছি নয় একটা খবরও নিয়ে এসেছি।

অপর্ণা। খবর !

সূর্যকান্ত। হাঁ, চন্দ্রকুমার আর কোনদিন আসবে না।

অপর্ণা। তাই নাকি ?

সূর্যকান্ত। হাঁ, এইমাত্র সেখান থেকেই আমি আসছি। রাজেশ্বর চৌধুরী তাকে পাইক দিয়ে পথ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মহালের মধ্যে আটকেছে। একেবারে বিবাহের পর সে পাবে মুক্তি !

অপর্ণা। মিথ্যা কথা।

সূর্যকান্ত। মিথ্যা যে নয় ক্রমশই জানতে পারবে। যাক সে কথা। ভেবেছিলাম তুমিই আমার হাতে তুলে দেবে সরযূকে স্বেচ্ছায়। তা যখন হলো না শুনে রাখো, আগামী পরশু রাত্রে তাকে আমি বিবাহ করবো।

[চকিতে অপর্ণা কটিদেশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা টেনে সূর্যকান্তকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারে কিন্তু ব্যাপারটা পূর্ব হতেই অনুমান করে সতর্ক সূর্যকান্ত চকিতে সরে যায়। ছোরাটা গিয়া মাটিতে পড়ে। পা দিয়ে ছোরাটা তুলে নিয়ে অপর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে সূর্যকান্ত এবার বলে]

উত্তম। মেনে নিলাম তোমার এ যুদ্ধের আহ্বানকে !

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]।

॥ দৃশ্য : তিন ॥

[রাত্রি। রাজেশ্বর চৌধুরীর বাইরের ঘর। বাঘের মত অস্থির পদে পায়চারি করছেন রাজেশ্বর চৌধুরী ঘরের মধ্যে।]

রাজেশ্বর। হেরে গেলাম। আমি রাজেশ্বর চৌধুরী, সামান্য একটা রাজপুতানীর কাছে হেরে যাবো? না। না— [একটু থেমে] উঃ। সরযূ! সরযূ যদি অপর্ণারও মেয়ে হতো। হতভাগা এ তুই কি করলি? অজ্ঞাতকুলশীলা একটা তুচ্ছ যুবতী কন্যার রূপের মোহে তুই কিনা এত বড় চৌধুরী বংশের মুখে কালি লেপে দিলি!

[কিছুক্ষণ থেমে আবার পায়চারি করতে করতে]

না, না—এ হতে পারে না। এত বড় পরাজয় আমি মেনে নেব না। কে আছিস, একবার রঘুনন্দনকে ডেকে দে।

[সহসা এমন সময় ঘরে এসে প্রবেশ করেন জাহ্নবী। পদশব্দে চমকে ফিরে জাহ্নবীকে দেখে বলেন।]

এ কি! তুমি!

জাহ্নবী। [দু'পা এগিয়ে এসে] হাঁ, আমি!

রাজেশ্বর। বহির্মহলে, কাছারী ঘরে এত রাত্রে হঠাৎ এভাবে আসবার তোমার কি এমন প্রয়োজন হলো। চৌধুরী বাড়ির বৌ, তোমার যে একটা ইজ্জত, আভিজাত্য আছে—

জাহ্নবী। [ব্যঙ্গের হাসি হেসে] চৌধুরীবাড়ির বৌ! ইজ্জত! আভিজাত্য!

রাজেশ্বর। হাঁ, তোমার সেটা ভোলা উচিত হয় নি।

জাহ্নবী। না, ভুলিনি সে কথা, আর ভুলবোও না কোন দিন। এখুনি চলে যাবো, কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

রাজেশ্বর। জিজ্ঞাসা কবাব যা সে তো অন্দরে গেলেও জিজ্ঞাসা করতে পারতে। তার জন্য এত রাত্রে এঘবে আসবার কি প্রয়োজন ছিল। যাও, ভিতরে যাও। আমারা এখন জরুরী কাজ আছে! যাও—

[কিন্তু জাহ্নবী ঘর ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখলো না।]

জাহ্নবী। আমি জানতে চাই চন্দ্রকে এমন করে এনে ঘরের মধ্যে আটকালে কেন

রাজেশ্বর। [তীক্ষ্ণকণ্ঠে] জাহ্নবী!

জাহ্নবী। হাঁ, ভুলে যেও না, এবাড়ির বৌ আমি! এ বাড়ির গৃহিনী, ছেলের মা! তার ভাল মন্দ হিতাহিত জানবার অধিকার তোমারই মত আমারও আছে!

রাজেশ্বর। তাই নাকি। তাহ'লে দেখচি এত দিনে চৌধুরী গিন্নীর চেতনা হয়েচে। ভাল। তাহলে তোমাকেই একটা প্রশ্ন করি, তোমার প্রশ্নের জবাবটা দেবার আগে! বলি, এতই যদি তুমি আত্মসচেতন এই চৌধুরী বাড়ির হিতাহিতের জন্য, তবে নিশ্চয়ই জেনেছিলে, একমাত্র পুত্র তোমার প্রতি রাত্রে আত্মগোপন করে কোথায় নিশিযাপনে, অভিসারে যায়!

[জাহ্নবী একেবারে নির্বাক]

কি চৌধুরীগিন্নী জবাব দাও। একেবারে যে চুপ করে গেলে, বাক্যহারা!

জাহ্নবী। জানিনা।

রাজেশ্বর। জানো না!

জাহ্নবী। না।

রাজেশ্বর। কেন!

জাহ্নবী। কারণ প্রয়োজন মনে করিনি—

রাজেশ্বর। প্রয়োজন মনে করো নি! ভাল, তবে শোন, আমি প্রয়োজন মনে করেছি, আর করেছি বলেই বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাকে নজর বন্দী করেছি!

জাহ্নবী। বিবাহ! সে তো এখনো এক মাস দেরি।

রাজেশ্বর। এক মাস। না, না—জাহ্নবী, অত দেরি আমার সইবে না। এইমাত্র আমি তোমার এ ঘরে আসবার আগেই দ্রুতগামী অশ্বে জনার্দন রায়ের কাছে সংবাদ পাঠিয়েছি, আগামী পরশু পূর্ণিমার রাত্রেই বিবাহ হবে!

জাহ্নবী। কি বলচো তুমি! দিনক্ষণ না দেখে, তাছাড়া কোন যোগাড় যন্ত্র নেই—

রাজেশ্বর। নিশ্চিন্ত থাকো, দিন দেখেছি, ভালই আছে! আর যোগাড় যন্ত্রের কথা বলচো বড়বৌ, মনে পড়ে তোমার বিয়ের কথা! সপ্তাহকাল মধ্যে তোমাকে খুঁজে এনে আমার বাবা আমাদের বিয়ে দিয়েছিলেন।

জাহ্নবী। তাই বলে—

রাজেশ্বর। হাঁ, বাবা পেরেছিলেন আর তাঁর ছেলে হয়ে আমি পারবো

না। রাজা জগৎনারায়ণ চৌধুরীর ছেলে আমি, রাতা-রাতি লৌহবাসর গড়ে চন্দ্রকুমারের বাসর সাজাবো। দেখি মনসার কাল নাগিনী কেমন করে ঢোকে সেই লোহার বাসরে।

জাহ্নবী। এ সব কি বলচো তুমি?

রাজেশ্বর। ভয় পেলে চৌধুরী বাড়ির বৌ! ভয় নেই। কোন ভয় নেই। দেখচো, শালপ্রাংশুর মত দুটো আমার লৌহ কঠিন হাত। সব অমঙ্গল, সব আশঙ্কা, এই হাত দিয়ে আমি মুছে নেবো। যাও। নির্ভয়ে তুমি তোমার পুত্রের বিয়ের আয়োজন করো গিয়ে। সবাইকে ডাকো। দশ হাতে কাজ করো। পরশু রাত্রেই বিয়ে।

জাহ্নবী। সত্যিই তাহলে?

রাজেশ্বর। হাঁ, হাঁ—যাও। হাজার শঙ্খে ফুঁ দেওয়াবো। তারপর কালনাগিনী, তোর বাসর হবে আমার পাতাল ঘরে। হাঃ হাঃ হাঃ।

[হঠাৎ হাসি থামিয়ে দণ্ডায়মান স্ত্রীর দিকে চেয়ে]

ওকি! এখনো দাঁড়িয়ে দেখচো কি! যাও, যাও—আনন্দ করো, আনন্দ করো।

[জাহ্নবী চলে গেল]

অপর্ণা! অপর্ণা—

[রঘুনন্দনের প্রবেশ]

রঘুনন্দন। হুজুর।

রাজেশ্বর। [চমকে] কে! ও রঘু!

রঘু। আমাকে ডেকেছিলেন হুজুর।

রাজেশ্বর। হাঁ, একটা কাজ করতে হবে রঘু!

রঘু। বলুন।

রাজেশ্বর। [চাপা গলায়] যে কাজের ভার দেবো, কাকপক্ষীতেও না জানতে পারে। জানলে তোকে আমি জ্যান্ত রাখবো না জানিস।

রঘু। বলুন।

[এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় রাজেশ্বর বলে]

রাজেশ্বর। আগে বাইরেটা দেখে দরজাটা বন্ধ করে দে—

[রঘু লঘুপদে বাইরে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে দরজাটা বন্ধ করে দিল ঘরে ঢুকে।]

শোন! এ গাঁয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে যখের জঙ্গলের ধারে মহিম আচার্যের যে বাড়িটা জানিস!

রঘু। জানি।

রাজেশ্বর। সে বাড়িতে দুজন স্ত্রীলোক থাকে। তার মধ্যে যে খুব সুন্দরী, অল্প বয়স, নাম তার সরযূ!

রঘু। বুঝেছি—

রাজেশ্বর। শোন, দাঁড়া! পরশু তোর দাদাবাবুর বিয়ে, তার পরের দিন বৌভাত, পাকস্পর্শ!

রঘু। দাদাবাবুর বিয়ে।

রাজেশ্বর। হাঁ, বৌভাতের রাত্রে তুই সেই মেয়েটাকে যেমন করে হোক এখানে নিয়ে আসবি। পারবি!

রঘু। পারবো।

রাজেশ্বর। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন না জানতে পারে।

রঘু। তাই হবে।

রাজেশ্বর। একাই যাবি, না সঙ্গে আর কাউকে নিবি!

রঘু। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন হুজুর। যা করবার ঠিক করবো আমি--

রাজেশ্বর। যা, আর নায়েব মশাইকে ডেকে দিয়ে যা।

[সেলাম করে রঘুনন্দন চলে গেল ঘর থেকে। রাজেশ্বর আবার পায়চারি শুরু করে।]

কালনাগিনী! চাঁদ বণিকের লোহার বাসরে তুমি ঢুকেছিলে, এবারে দেখি তোমার কেরামতি। কে!

[দরজার বাইরে থেকে শ্যামাকান্তের গলার স্বর পাওয়া গেল।]

কে! শ্যামাকান্ত, ভিতরে এসো।

[শ্যামাকান্ত এসে ঘরে ঢুকল]

শ্যামাকান্ত। আমাকে ডেকেছিলেন!

রাজেশ্বর। হাঁ, পরশু চন্দ্রকুমারের বিয়ে!

শ্যামাকান্ত। আজ্ঞে—কি বলচেন আপনি!

রাজেশ্বর। যা বলবার তাই বলচি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নহবৎ বসবে। সানাই!

শ্যামাকান্ত। তা না হয় হলো, কিন্তু কোন যোগাড়যন্ত্র নেই! চৌধুরী বাড়ির বিয়ে।

রাজেশ্বর। সেই জন্যই তো আমি মনে কার চৌধুরী বাড়ির নায়েবের পক্ষে সেটা অসম্ভব হবে না।

শ্যামাকান্ত। কিন্তু—হুজুর।

রাজেশ্বর। ব্যাপাব কি বলতো শ্যামাকান্ত, মধ্যরাত্রে দশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে পাল্কার চবে দু'দুটোকে খুন কবে লাস আবাব নিয়ে এসে কি এব আগে শ্যামাকান্ত বৌড়ুবির খালের পাঁকের নীচে পুঁতে ফেলেনি! না শ্যামাকান্ত বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে পড়েচে। তাই যদি হয়ে থাকে তো, ছুটি নাও, ছুটি নাও—

শ্যামাকান্ত। আজ্ঞে তা নয়। বলছিলাম কন্যাপক্ষকেও তো একটা সময় দেওয়া প্রয়োজন!

রাজেশ্বর। হাঁ, তবে তাদের ভাবনা তোমার না ভাবলেও চলবে; তারা পারে ভালো, নচেৎ রাতারাতি আমি অন্য মেয়ে খুঁজে আনবো। মোট কথা আগামী পবশু চন্দ্রকুমারের বিয়ে হবে। বুঝলে!

শ্যামাকান্ত। আজ্ঞে।

রাজেশ্বর। যাও।

॥ মঞ্চ ঘুরে যাবে ॥

॥ দৃশ্য : চার ॥

[নিশ্চিন্দপুরে জনার্দন রায়ের বাড়ির অলিন্দের একাংশ। চারিদিকে বিবাহের ব্যস্ততা। মঞ্চ ঘোরার সঙ্গে সঙ্গেই সানাইয়ের আলাপ শোনা যায়। অলিন্দের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। লোকজন যাতায়াত করচে। একজন বোষ্টমী একতারায় টুং টুং শব্দ তুলে এসে প্রবেশ করলো। সামনে কর্মব্যস্ত একজন দাসীকে দেখে শুধায়—]

বোষ্টমী। আমার দিদিমণি কই গো শ্যামা!

শ্যামা ঝি। কে জানে কোথায়। কাজের বাড়িতে কি আর দেখা হবে?

[ঠিক ঐ সময় কপালে চন্দনের তিলক নতুন শাড়ী পরিধানে, হাতে গহনা। স্বর্ণলতা ও তার সই শ্রীমতী অলিন্দে এসে প্রবেশ করে।]

শ্রীমতী। ওলো সই, শোন, শোন—

স্বর্ণলতা। দেখ্ ভাল হবে না বলচি।

বোষ্টমী। দিদিমণি!

স্বর্ণলতা। [বোষ্টমীর ডাকে ফিরে] বোষ্টমী দি, এসো কখন এলে!

বোষ্টমী। দাঁড়াও দাঁড়াও—দেখি, আহা, মরি মরি, কপালে চন্দন তিলক।

স্বর্ণ। [সলজ্জে মৃদু হেসে] একটা গান শোনাও না বোষ্টমী দি!

বোষ্টমী। গান! [এক তারায় টুং টুং শব্দ তুলে গায়]

চৌধুরী বাড়ি

॥ গান ॥

কাল আসচে হর নিতে গৌরী
শোন, শোন গিরি,
পরাণ আমি কেমনে রাখি
কোন প্রাণে পাঠাবো উমায়
সে কৈলাস পুরী ॥

[গান শেষ হবার আগেই জনার্দন রায় ও কুলগুরু নিশানাথ শর্মা অলিন্দে এসে ঢোকেন। তাদের দেখে স্বর্ণ ও শ্রীমতী পালায়। বোষ্টমীও চলে যায় তাড়াতাড়ি গান মাঝ পথেই থামিয়ে।]

জনার্দন। স্বর্ণ চলে যাবে কাল, এই শূন্য পুরীতে স্বর্ণকে ছেড়ে যে কেমন করে থাকবো গুরুদেব!

নিশানাথ। এই যে নিয়ম জনার্দন! কন্যাসন্তান, সে যে অন্যের সম্পত্তি। জন্ম হতে তার বিবাহের পূর্বপর্যন্ত তুমি তার রক্ষক ও পালনকর্তা মাত্র।

জনার্দন। কি নিষ্ঠুর বিধান গুরুদেব।

নিশানাথ। দুঃখ করো না জনার্দন! সুখ, দুঃখ, বন্ধন, মুক্তি, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ এই নিয়েই তো সংসার। তা ছাড়া নারী, ওরা হচ্ছে অমর দীপ, এক সংসার থেকে অন্য সংসারে আলো দিতেই যে ওদের জন্ম। স্বয়ং মহামায়ার অংশ, তাই এত মায়া। আর তাইতো ওদের না যায় বাঁধা, না যায় ছাড়া, মায়ায় ওরা নিজেও কাঁদে, পরকেও কাঁদায়।

জনার্দন। সবই বুঝি গুরুদেব, কিন্তু মনকে কিছুতেই বোঝাতে

পারি না। স্বর্ণ মা আমার কালই শ্বশুর বাড়ি যাবে, ঘর আমার অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিশানাথ। কিন্তু শুনেছিলাম যে সামনের মাসে বিয়ে, তা হঠাৎ এইভাবে একদিনের মধ্যে—

জনার্দন। কি জানি, জানি না গুরুদেব। হঠাৎ গতকাল রাজেশ্বরের এক জরুরী পত্র এসে হাজির, বিবাহ আজকেই দিতে হবে। আমার অবিশ্যি সব প্রস্তুতই ছিল—

[বাইরে থেকে নারী কণ্ঠ শোনা যায়,

নারী কণ্ঠ। অধিবাস! অধিবাস এসেচে। উলু দে, উলু দে। শাঁখ বাজা।

উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি মুহুর্মুহু শোনা যায়]

পুরুষ কণ্ঠ। সানাই! সানাই বাজা।

[সানাই বেজে ওঠে দ্বিগুণ উৎসাহে। এমন সময় একজন বর্ষিয়সী সধবা মহিলা অলিন্দে এসে প্রবেশ করেন।]

মহিলা। এই যে ঠাকুরপো, বরের জোড়, আংটি আর কণ্ঠহার সব তুমি নাকি বরের ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছো।

জনার্দন। হাঁ রাঙা বৌদি।

মহিলা। কিন্তু এ আবার কেমন ধারা—

জনার্দন। চৌধুরী বাড়ির কুলপ্রথা নাকি ঐ সব পরেই পাত্র আসবে তার বাড়ি থেকে বিয়ে করতে।

মহিলা। জানি না বাপু, রাজেশ্বর চৌধুরীর সবই উলটো। নোটিশ দিয়ে একদিনে বিয়ে।

জনার্দন। তুমি একটু ওধারে যাও রাঙা বৌদি, অধিবাস যারা এনেচে তাদের যেন কোন অযত্ন না হয়।

মহিলা। না, না সে সব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

[মহিলা অন্দরের দিকে চলে গেলেন। শ্যামাকান্ত অন্য দ্বারপথে এসে প্রবেশ করে।]

জনার্দন। এই যে নায়েব মশাই আসুন! ওরা তাহলে কখন পৌচচ্ছেন?

শ্যামাকান্ত। তা বিকাল নাগাদ পৌছে যাবেন।

জনার্দন। লোকজন মানে বরযাত্রীরা সব ঐ সঙ্গেই আসচেন তো?

শ্যামাকান্ত। বরযাত্রী আর কোথায়? কর্তাবাবু আর চন্দ্রকুমারই আসবে।

নিশা। সে কি নায়েব মশাই, আত্মীয় স্বজনরা কেউ আসচেন না?

শ্যামাকান্ত। তার আর সময় পেলেন কোথায? বলছিলেন সামনের মাসে আসল উৎসব করবেন।

নিশা। তা এভাবে সাত তাড়াতাড়ি কবে কাজই বা করচেন কেন?

শ্যামাকান্ত। কেমন করে বলবো বলুন, আমি ভৃত্য বইতো নয়। হুকুমের চাকর। তবে শুনলাম, দৈবাচার্য নাকি বলেছেন, আজকের মত শুভ দিন নাকি এ মাসের মধ্যে আর নেই। তারপরই পড়ছে চৈত্র মাস। আর চৈত্র মাসের পরই জোড়া বৎসর। তাই আর কি—। কর্তা মশাই আবার এই সব দিনক্ষণের ব্যাপারে বেশি রকমই একটু কুতকুতে কিনা।

[অন্দর থেকে ঐ সময় আবার শাঁখ ও উলুধ্বনি শোনা যায়। সানাইও জোরে বেজে ওঠে।]

জনার্দন। চলুন নায়েব মশাই, আমার ঘরে চলুন! আসুন গুরুদেব।

নিশা। তুমি আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না জনার্দন! ওর সঙ্গে তুমি কথাবার্তা বলগে!

[সানাই বাজতে থাকে। জনার্দন ও শ্যামাকান্ত দরজার দিকে এগিয়ে যান। মঞ্চ ঘুরে যায়।]

॥ দৃশ্য : পাঁচ ॥

[চৌধুরী বাড়ি। আজ ফুলশয্যার রাত্রি। ফুলে ফুলে ঘরটি সাজানো। পালঙ্কের উপর নববধূ বেশে উপবিষ্ট স্বর্ণলতা। আশে পাশে চার পাঁচটি মেয়ে। সামনের খোলা জানালা পথে ভেসে আসচে সানাইয়ের সুর। দেওয়াল ঘড়িতে রাত বারটা বাজে প্রায়, দেখা যাচ্ছে। মাধবীও আছে ঘরে।]

সরমা। আজকে বৌয়ের একটা গান না শুনে আমরা কিন্তু নড়চি না।

কমলা। যা বলেচো ভাই। গাও না বৌ একটা গান।

স্বর্ণ। আমি তো গান গাইতে জানিনা।

মণিমালা। ওমা তাই নাকি! না গাইতে লজ্জা করচে।

সরমা। ও কি আর এখন গাইবে। গাইবে সেই রাত্রে যখন একা শুনবে কেবল চন্দ্রদা!

কমলা। তবে ভাই মাধু, তুই-ই একটা গান গা।

মাধবী। সেকি! আমি গান গাইবো কেন! আজ কি আমার গান গাইবার কথা। গাইবে তো বৌ!

কমলা। শুনলি তো, বউ গাইতে জানে না!

মণিমালা। ওগো বৌ, তুমিই না হয় তোমার ননদিনীকে বলো একটা গান গাইতে।

স্বর্ণ। গাওনা একটা গান, মাধবী।

মাধবী। [মৃদু হেসে] তবে আর না করি কি করে।

[মাধবী গান গায়।]

॥ গীত ॥

আজি এ মাধবী রাতে চাঁদ তুমি কয়েনাকো কথা
শুধু শোন, চুপি চুপি শোন,
বাসর প্রদীপ আমি
জেগে রবো সারা রাতি
কয়োনাকো কথা কোন।
ধূপ দিও তব সুরভি
রাতের বাতাসে ছড়ায়ে,
মধুপের গুণ গুণ
দিও নাকো জাগায়ে।
আজ কোন কথা নয়, কোন গান কোন সুর
নয়নে নয়ন রাখি শুধু জেগে থাক দু'টি আঁখি
আজি এ মাধবী রাতে কয়োনাক কথা কোন।

[মাধবীর গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কমলা বলে।]

কমলা। হাঁ ভাই মাধু, চন্দ্রদার কি ব্যাপার বলতো, রাত বারটা হতে চললো এখনো তার দেখা নেই!

মাধবী। কি জানি! দাদাটা যেন কি! এখনো দেখাই নেই! ঘুম পেয়েচে তোমার খুব তাই না বৌদি?

[স্বর্ণ মাথা নেড়ে সলজ্জ হাসি হাসলো। এমন সময় চন্দ্রকুমার এসে ঘরে ঢুকলো।]

এই যে দাদাভাই, তোমার আক্কেলটা কি বলতো!

চন্দ্র। কেন!

মাধবী। নয়, এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

[জাহ্নবী এসে ঘরে ঢোকে]

জাহ্নবী। হ্যাঁরে চন্দ্র এল !

চন্দ্র। মা।

জাহ্নবী। হ্যাঁরে, এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলি !

চন্দ্র। বাগানে একটু বেড়াচ্ছিলাম মা, মাথাটা বড্ড ধরেছিল—

[উদ্বিগ্ন জাহ্নবী এগিয়ে এসে পুত্রের কপাল স্পর্শ করে বলে—]

জাহ্নবী। তাই মুখটা অত শুক্‌নো, শুক্‌নো—দেখি—

চন্দ্র। না, না—তেমন কিছু না, ব্যস্ত হতে হবে না।

জাহ্নবী। কিন্তু গা টা যে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করচে।—

চন্দ্র। না, না—কিছু না।

জাহ্নবী। দেখ দেখি এত রাত পযন্ত বাগানে কেউ থাকে! মাধু, শরীর ভালো না ওর, ওকে এবারে একটু শুতে দে, মা—

কমলা। মাসীমা যেন কি, আজকের রাতে আবার শরীর খারাপ কি !

জাহ্নবী। না রে না, তোরা সব আয়।

কমলা। তবে আর কি হবে, আয় ভাই—

[জাহ্নবীই সকলকে নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্বর্ণ মাথা নীচু করে পালঙ্কের উপর বসে থাকে, চন্দ্র দরজাটা বন্ধ করে গিয়ে ঘরের খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়ালো। স্তব্ধ রাত; শুধু সানাইয়ের মৃদু একটা স্বর ভেসে আসচে। চন্দ্রকুমার পকেট থেকে সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করে। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ একসময় ফিরে

চেয়ে দেখে স্বর্ণ তেমনি করেই শয্যার উপরে বসে। এগিয়ে আসে চন্দ্র স্ত্রীর সামনে।]

চন্দ্র। ওকি! তুমি এখনো বসে আছো কেন, শুয়ে পড়ো!

স্বর্ণ। আপনি শোবেন না?

চন্দ্র। না। আমার ঘুম আসচে না, তুমি শুয়ে পড়ো।

স্বর্ণ। মাথার যন্ত্রণাটা কি এখনো কমে নি?

চন্দ্র। সে জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি শুয়ে পড়ো।

[স্বর্ণ কথারও জবাব দিল না। শোবারও কোন লক্ষণ দেখাল না। জানালার কাছ থেকে আবাব ফিরে এল চন্দ্র।]

কই, শুলে না।

[স্বর্ণ নির্বাক]

দেখো, বিয়ের রাত্রে তোমাকে একটা কথা বলা হয় নি।

[নিঃশব্দে স্বর্ণ স্বামীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালো]

আমার বাবাই একপ্রকার জোর করে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়েচেন। সে দিক থেকে তুমি এই চৌধুরী বাড়িরই বধূ! তবে আমি তোমাকে কোনদিনই স্ত্রীর আসনে বসাতে পারবো না।

[নিঃশব্দে চেয়ে থাকে স্বর্ণ স্বামীর মুখের দিকে]

অবিশ্যি, তোমার কোন কাজেই আমি কোন দিক থেকে বাধা দেবো না। যেমন তোমার খুশি চলতে পারো।—

স্বর্ণ। কেন?

চন্দ্র। [বিস্ময়ে মুহূর্তকাল স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে] কেন

আবার কি। যা বললাম মনে রেখো! এবারে তুমি শুয়ে পড়ো,—

[বলে এগিয়ে যায় চন্দ্র দরজার দিকে। দরজা খুলতেই]

স্বর্ণ। কোথায় যাচ্ছেন।

চন্দ্র। [বিরক্ত কণ্ঠে] যেখানে আমাব খুশি আমি যাচ্ছি। তোমার কাছে তাব জবাবদিহি করতে হবে নাকি ?

[স্বর্ণ ততক্ষণে পালঙ্ক থেকে উঠে এসে স্বামীব সামনে দাঁড়িয়েচে।]

স্বর্ণ। তা নয়, শুধু জিজ্ঞাসা কবছিলাম এই জন্য যে, আজকের রাতটা এভাবে না গেলেই কি ভাল হয না।

চন্দ্র। কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ তাও কি তোমার কাছ থেকে আমার শিক্ষা নিতে হবে ?

স্বর্ণ। তা আমি বলিনি, কেউ দেখতে পেলে কি বলবে, তাই বলছিলাম।

চন্দ্র। কিছু এসে যায় না তাতে আমাব। পথ ছাড়ো।

[স্বর্ণ ততক্ষণে দরজার সামনে বাহু বদ্ধ করে দাঁড়িয়েচে। সে নড়ে না।]

স্বর্ণ। কিন্তু আপনি যাবেনই বা কেন। আপনি পালঙ্কে গিয়ে শয়ন করুন, আমি নীচে শোব'খন।

চন্দ্র। না, না—পথ ছাড়ো।

স্বর্ণ। না, আগে আপনাকে বলতে হবে আপনি কোথায় যাবেন এত রাত্রে।

চন্দ্র। স্বর্ণলতা! তুমি কি তাহলে আমাকে জোর করেই ঘরের মধ্যে ধরে রাখতে চাও নাকি !

স্বর্ণ। না। আমি কেবল বলতে চাই, এভাবে আজকের রাত্রে আমাকে আপনি কেন অপমান করচেন।

চন্দ্র। অপমান!

স্বর্ণ। হাঁ, আজকের এই উৎসবের রাত যদি না হতো, আপনাকে আমি আটকাতাম না।

চন্দ্র। স্বর্ণলতা। তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না। পথ ছাড়ো।

স্বর্ণ। বললাম তো আজ রাত্রে ঘর থেকে আপনাকে আমি বের হতে দেবো না।

চন্দ্র। দেবে না।

স্বর্ণ। না।

[সহসা ক্ষিপ্তের মত চন্দ্রকুমার স্বর্ণলতার একটা হাত ধরে হেঁচকা একটা টান দিতেই স্বর্ণ একপাশে পড়ে গেল। চন্দ্র দৃঢ়পদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। দরজা খোলাই থাকে। ধীরে ধীরে এক সময় স্বর্ণলতা হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে বসলো। তার দু' চোখের কোলে জল, মাধবী এসে ঘরে প্রবেশ করে স্বর্ণর মুখের দিকে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়ায়।]

মাধবী। বৌদি।

স্বর্ণ। কে! [উঠে দাঁড়িয়েচে ততক্ষণে স্বর্ণ।]

মাধবী। কি হয়েচে বৌদি। দাদা ঝড়ের মত দেখলাম সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

স্বর্ণ। মাধবী!

মাধবী। একি বৌদি, তোমার চোখে জল!

[তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নেয় স্বর্ণ। তারপর মাধবীর দিকে চেয়ে বলে।]

স্বর্ণ। জল! কে বললে!

মাধবী। আমার কাছে লুকোতে পারবে না বৌদি, ভুলে যাচ্ছো কেন, আমিও যে তোমার মতই মেয়েমানুষ। কি হয়েচে বৌদি।

[মাধবী এসে দু'হাতে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরতেই স্বর্ণ মাধবীর বুকের পরে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে কেঁদে ফেলে।]

স্বর্ণ। মাধবী।

মাধবী। ওরে থাম! চুপ কর, চুপ কর। আমি জানতাম, আমি জানতাম—

স্বর্ণ। [বিস্ময়ে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে] মাধবী!

মাধবী। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোর ঐ চাঁদমুখখানা দেখলে বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু এখন বুঝতে পারচি, কেবল তোর ঐ রূপ আর চাঁদ মুখখানাই আছে। কোন মুরোদ নেই আর!

স্বর্ণ। মাধবী! মাধবী, তবে কি?—

মাধবী। ছিঃ ছিঃ একটা পুরুষ বেটাছেলেকে মেয়েমানুষ হয়ে ধরে রাখতে পারলি না। এই ক্ষমতা নিয়ে তুই চৌধুরী বাড়ির বৌ হয়ে এসেছিস?

স্বর্ণ। তবে—তবে কি!

মাধবী। কি?

স্বর্ণ। এই জন্যই একদিনের নোটিশ দিয়ে আমার বাবাকে—

মাধবী। হাঁ! কিন্তু এমনি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। আয় আমার সঙ্গে—

[মাধবী স্বর্ণর একখানা হাত ধরে আকর্ষণ করে]

স্বর্ণ। কোথায় ?

মাধবী। কোথায় আবার, বাবার কাছে!

স্বর্ণ। বাবার কাছে!

মাধবী। হাঁ, চল আর দেরি করিস না।

স্বর্ণ। ছিঃ।

মাধবী। [বিস্ময়ে] কি বলচিস বৌ!

স্বর্ণ। হাঁ, স্বামীকে ফুলশয্যার রাত্রে ঘরে আটকে রাখতে পারলাম না, তার প্রতিকার চাইবো কিনা গিয়ে শ্বশুরের কাছে। ছিঃ!

মাধবী। বৌ।

স্বর্ণ। না, তার আগে স্বর্ণ গলায় দড়ি দেবে। তুমি যাও মাধবী,—

মাধবী। বোকামী করিস না বৌদি।

স্বর্ণ। পারি যদি নিজেই আনবো আমার স্বামীকে ফিরিয়ে। আর তা যদি না পারি তোমাদের এই চৌধুরী বাড়ির বধূর অধিকার ছেড়ে দিয়ে জন্মের মতই চলে যাবো জেনো।

মাধবী। সত্যি বলচিস বৌদি!

স্বর্ণ। হাঁ! হতে পারে তোমার দাদা চৌধুরী বাড়ির ছেলে, আমিও জনার্দন রায়ের মেয়ে।

চৌধুরী বাড়ি

[মাধবী দু'হাতে আনন্দে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরে]

মাধবী। বৌদি, বৌদি। আমার সোনা বৌদি। লক্ষ্মী বৌদি। আয় আমার সঙ্গে—

স্বর্ণ। কোথায়?

মাধবী। আয় না—

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে ঘুরে যাবে]

॥ দৃশ্য : ছয় ॥

[রাত্রির মধ্যযাম। যশের জঙ্গলের মধ্যবর্তী সরু পথ। চারিদিকে গাছপালা। একটানা ঝিঁঝির ডাক রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করচে। দূরে ঘোড়ার খুরের খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সূর্যকান্ত ও ষণ্ডামার্ক একটা লোকের প্রবেশ। ষণ্ডা লোকটার নাম কেতু।]

কেতু। এই পথ ?

সূর্যকান্ত। হাঁ, এই পথ দিয়েই সে আসা যাওয়া করে। কাল যখন আসেনি, আজ সে আসবেই।

কেতু। ঠিক আছে, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়িতে গিয়ে ঘুমোও।

সূর্যকান্ত। না, লাস এ তল্লাটে রাখলে হবে না। একেবারে বৌড়ুবীর খালের জলের নিচে শাঁকোর তলায় গিয়ে পুঁতে ফেলতে হবে।

[দূরে এমন সময় আবার ঘোড়ার খুরের খটাখট্ শব্দ মনে হলো ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসচে—]

চুপ ! ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দাঁড়া তুই এখানে একটু, আমি এখুনি আসচি—

[সূর্যকান্ত আড়ালে চলে গেলো। ঘোড়ার খুরের শব্দ আরো স্পষ্ট শোনা যায়, তারপর এসে থামে যেন খুব কাছে। সূর্যকান্ত দ্রুতপদে এসে ঢোকে।]

এসে গেছে। মনে থাকে যেন।

[দু'জনেই গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে, একটু পরেই দেখা গেল চন্দ্রকুমার সেই পথে এলো। এগিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ সামনে

এসে দাঁড়ালো লাঠি হাতে কেতু। এবং চন্দ্রকুমারকে আক্রমণ করল পশ্চাৎ দিক থেকে। আক্রমণের আগেই চন্দ্রকুমার পদশব্দে ফিরে চেয়েছিল, কেতুর লাঠি মাথার উপরে নেমে আসবার পূর্বেই কৌশলে লাঠিটা ধরে ফেলে এক থাপ্পড় দিয়ে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে আঘাত করে কেতুর মাথার উপরে। বাপ্ বলে কেতু বসে পড়ে।]

কেতু। ওরে বাবা! গেছিরে গেছি। একেবারে গেছি।

[চন্দ্রকুমার লাঠিটা হাতে কেতুব সামনে এসে দাঁড়ায়। কেতু তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সেই সময় সামনে এসে অতর্কিতে চন্দ্রর হাত থেকে লাঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে পথরোধ করে দাঁড়ালো সূর্যকান্ত।]

সূর্যকান্ত। [হাতে ছোরা] দাঁড়াও—

চন্দ্র। কে!

সূর্য। তোমার সঙ্গে আমাব কিছু কথা ছিল চন্দ্রকুমার। আমি সূর্যকান্ত।

চন্দ্র। সূর্যকান্ত!

সূর্য। হাঁ। এত রাত্রে কোথায় চলেছো?

চন্দ্র। তাতে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

সূর্য। আছে বৈকি! আর সেই জন্যই প্রশ্ন। যাচ্ছো তো সরযূর কাছে—

চন্দ্র। [গর্জে উঠে] সূর্যকান্ত!

সূর্য। দেখচো আমার হাতে কি! ও চোখ রাঙানীতে ভয় সূর্যকান্ত করে না। বরং যে প্রশ্ন করচি তার জবাব দাও। সরযূকে তুমি ভালবাসো?

চন্দ্র। সে প্রশ্নেও তোমার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

সূর্য। ভাল চাওতো জবাব দাও চন্দ্রকুমার—

চন্দ্র। [মৃদু হেসে] কি জানতে চাও সূর্যকান্ত, সরযুকে আমি ভালবাসি কিনা ? হঁা, ভালবাসি।

সূর্য। ভালবাসো ? তাহ'লে চন্দ্রকুমার, সরযুর জীবনপথ থেকে যে তোমাকে সরে যেতে হবে।

চন্দ্র। সরে যেতে হবে !

সূর্য। হঁা, শোন চন্দ্রকুমার, নিজের মঙ্গল যদি চাও তো, সরযুর জীবনপথ থেকে সরে দাঁড়ালে বুদ্ধিরই পরিচয় দেবে।

চন্দ্র। তাই নাকি ?

সূর্য। হঁা। আকাশে যেমন দুটি চন্দ্র থাকতে পারেনা, তেমনি এ পৃথিবীতে সরযুর প্রেমাকাঙ্ক্ষী দু'জন থাকতে পারে না। থাকবেও না।

চন্দ্র। শুনলাম, তারপর ?

সূর্য। হয় সরযূ আমার হবে নচেৎ তুমিই তাকে পাবে। হয় সরে দাঁড়াতে হবে তোমাকে, নচেৎ সরে দাঁড়াবো আমিই ! দু'জনার একজনকে যেতেই হবে।

চন্দ্র। তাহ'লে জান, সরে দাঁড়াতে হবে তোমাকেই সূর্যকান্ত !

সূর্য। চন্দ্রকুমার, শেষবারের মত আবার তোমাকে বলচি, তুমি হয়ত জানোনা যে, প্রেমের স্বপ্নে মশগুল হ'য়ে সাক্ষাৎ বাঘের গহ্বরে তুমি পা দিয়েচো—

চন্দ্র। বাঘের গহ্বর—

[চন্দ্রকুমারের কথা শেষ হবার পূর্বেই অতর্কিতে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত ছোরাটা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে সূর্যকান্ত তার উপবে। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে গিয়ে চন্দ্রকুমার ছোরা সমেত সূর্যকান্তর হাতটা ধরে ফেলে। তারপর শুরু হয় দু'জনে ধ্বস্তাধ্বস্তি। শেষপর্যন্ত ক্ষিপ্র কৌশলে চন্দ্রকুমারই সূর্যকান্তকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপরে চেপে বসে বলে হাঁপাতে হাঁপাতে—]

সূর্যকান্ত! এবাবে যদি তোমাকে আমি হত্যা করি—

সূর্য। অনায়াসেই করতে পারো। শত্রুর কাছে সূর্যকান্ত প্রাণ ভিক্ষা কবে না কোনদিন—

[সূযকান্তকে গলাধবে টেনে দাঁড় করিয়ে ছোবাটা নিজের মুঠিতে ধরে চন্দ্রকুমাব বলে—]

চন্দ্র। না। অযথা প্রাণক্ষয় আমি করি না। আর বিশেষ করে তোমার মত একটা নগণ্য কীটকে মেরে হাত আমার কলঙ্কিত করবো না। তোমাকে আমি মুক্তিই দেবো—

সূর্য। খুশি তোমার।

চন্দ্র। হাঁ মুক্তিই দিলাম, তবে শেষ বারের মত—। মনে বেখো একটা কথা, দ্বিতীয়বার এতল্লাটে যদি কখনো তোমার ছায়া পর্যন্ত দেখি, সেদিন আর তোমাকে ক্ষমা কববো না। যাও—

[একটা ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল চন্দ্রকুমার সূর্যকান্তকে।]

আরো একটা কথা মনে রেখো, বন্দুকের নিশানা আমার অব্যর্থ শব্দভেদী বাণের মতই লক্ষ্য ভেদ করে।

[সূর্যকান্তকে চলে যেতে দেখে গোঙ্গাতে গোঙ্গাতে কেতু বলে—]

কেতু। দোহাই দেবতা; আমাকে একটু সঙ্গে নিয়ে যাও ক্ষেমা ঘেন্না করে—

[রক্তঝরা দৃষ্টিতে সূর্যকান্ত কেতুর দিকে একবার চেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেতু এবারে চন্দ্রকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে—]

আমার কি হবে কর্তা।...তবে কি আমি একাই এই অন্ধকার জঙ্গলে পড়ে থাকবো!

চন্দ্র। ঘোড়ায় যদি চাপতে পারো তো, ওদিকে আমার ঘোড়াটা বাঁধা আছে, চেপে চলে যাও—

কেতু। ঘোড়া, ওরে বাবা, ডান পায়ের হাড়তো আপনি ভেঙ্গেচেনই; এবারে আপনার ঘোড়া হয়ত বাদবাকী শরীরের হাডগুলো গুঁড়িয়ে শেষ করে দেবে—

চন্দ্র। তবে আর কি করি বলো—

[বলতে বলতে চন্দ্রকুমার এগিয়ে যায়। তাই দেখে কেতু আবার অনুনাসিক স্বরে কেঁদে বলে—]

কেতু। ওকি দয়াময়, সত্যি সত্যিই চললেন যে—একটু ক্ষেমাঘেন্না করে ব্যবস্থা করে যান! না হয় পিছন থেকে না জেনে লাঠি বসাতেই গিয়েছিলাম!

[হঠাৎ এমন সময় দেখা গেল পাগলিনীর মতই সেই পথে ছুটতে ছুটতে অপর্ণা এসে প্রবেশ করে। তার কেশ বাস আলুথালু। তাকে দেখে চন্দ্রকুমার চমকে ওঠে—]

চন্দ্র। কে! একি অপর্ণা, কোথায় চলেচো।

অপর্ণা। কে, চন্দ্রকুমার! সর্বনাশ। সর্বনাশ হয়ে গিয়েচে—

চন্দ্র। কি! কি ব্যাপার?

অপর্ণা। সরযূ! সরযূ—

চন্দ্র। সবযূ! কি, কি হয়েচে সরযূর। বল, বলো অপর্ণা—

অপর্ণা। সরযূকে কিছুক্ষণ আগে যেন কারা ধরে নিয়ে গিয়েচে।

চন্দ্র। [ব্যগ্রকণ্ঠে] ধবে নিয়ে গিয়েচে, কি বলচো তুমি?—কে, কারা?

অপর্ণা। জানি না। ঘোড়ায় চেপে মুখে মুখোস এঁটে এসেছিল, চিনতে পারিনি! আমি আর সরযূ একঘরে শুয়েছিলাম। অতর্কিতে তারা আমাকে আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর জ্ঞান হলে দেখি সরযূ ঘরে নেই—

চন্দ্র। বুঝেচি! আমি বুঝেচি—

অপর্ণা। চন্দ্রকুমার!

চন্দ্র। বুঝেচি, এ আর কারো কাজ নয়, বাবাব—

অপর্ণা। বাবার। মানে তোমার বাবার?—

চন্দ্র। হাঁ—হাঁ—আমি চললাম।

[এগিয়ে যায় চন্দ্রকুমার। অপর্ণা বাধা দেয়—ডাকে।]

অপর্ণা কোথায় চললে চন্দ্রকুমার! দাঁড়াও—দাঁড়াও—

চন্দ্র। [যেতে যেতে] না, না—দাঁড়াবার আর সময় নেই। সরযূ! সরযূ—

[ছুটে চন্দ্রকুমার ঝড়ের মতই বের হয়ে গেল।]

অপর্ণা। শোন! শোন—চন্দ্রকুমার! চন্দ্রকুমার—

[অপর্ণাও ছোটে চন্দ্রকুমারকে অনুসরণ করে]

॥ যবনিকা ॥

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

॥ দৃশ্য ঃ এক ॥

[রাজেশ্বর চৌধুরীর বাইরের ঘর। দেওয়ালে দেওয়ালগিরি জ্বলচে। কিন্তু বাতিটা মৃদু। ঘরের মধ্যে অদ্ভুত একটা আলো ছায়ার রহস্য। বাঘের মতই একাকী রাজেশ্বর চৌধুরী ঘরের মধ্যে পায়চারি করচেন।]

রাজেশ্বর। আঃ এত দেরি হচ্ছে কেন! রঘুনন্দন কি তবে কাজ হাসিল করতে পারলে না।

[ঢং ঢং করে রাত তিনটে বাজলো কাছারীর পেটা ঘড়িতে। একদল শিবা ডেকে উঠ্‌লো।]

রাত তিনটে বেজে গেল!…তবে—মাধব!

[চকিতে মাধব ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো।]

আমার ঘোড়া—

[এগিয়ে গিয়ে রাজেশ্বর দেওয়াল থেকে একটা তরোয়াল পেড়ে নেন। ঠিক ঐ সময় পাঁজা কোলে করে মুখে মুখোস রঘুনন্দন সরযূকে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। সরযূর চুল এলোমেলো মুখে কাপড় বাঁধা।]

রঘু। হুজুর, এই নিন—

রাজেশ্বর। এনেচিস! দে, মুখের বাঁধনটা খুলে দে!

[রঘুনন্দন সরযূর মুখের বাঁধনটা খুলে দিতেই সোজা হয়ে গ্রীবা বেঁকিয়ে দাঁড়ালো সরযূ রাজেশ্বরের দিকে চেয়ে।]

সরযূ। কেন, কেন আপনি আমাকে এভাবে ধবে নিয়ে এলেন বলুন!

রাজে। জানো না কেন?

সরযূ। না, আর সেটাই জানতে চাই!

[এক পাশে রঘুনন্দন ও এক পাশে মাধব স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সরযূর পথ রোধ করে।]

রাজে। জানতে চাও?

সরযূ। হাঁ, জানতে চাই, ঘুমন্ত অবস্থায় অতর্কিতে চোবের মত কেন আমাকে ধরে নিয়ে এলেন এখানে!

[রাজেশ্বর সরযূর মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচেন।]

হাসচেন! লজ্জা করচে না আপনার, এক অসহায় ঘুমন্ত নারীকে পাইক পাঠিয়ে এমনি করে ধরে নিয়ে আসতে—

রঘু। [সরোষে] এই ছুঁড়ি—

রাজে। এই! সরে দাঁড়া। যা—তোবা বাইরে যা—

[নিঃশব্দে মাধব ও রঘুনন্দন ঘব থেকে বের হয়ে গেল। সরযূও দরজার দিকে এগুচ্ছিল। তাই দেখে রাজেশ্বব বলে ওঠেন।]

কোথায় যাচ্ছো সবযূ দেবী! এটা রাজেশ্বর চৌধুরীর প্রপিতামহ রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুবীর মহাল। এখানে প্রবেশের পথ ঐটা হলেও যাবার পথতো ওটা নয়—

[ফিরেও তাকায় না সরযূ, এগিয়ে যায়। খোলা দরজা বরাবর এগুতেই বিদ্যুৎ চমকের মতো ধারালো তীক্ষ্ণ দুটো বর্শার ফলা দরজা পথে ঝলকে ওঠে। সভয়ে সরযূ থমকে দাঁড়ায়।—]

হাঃ হাঃ! কই গেলে না, যাও সরযূ দেবী!

সরযূ। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] ছেড়ে দিন আমাকে, যেতে দিন।

রাজে। যেতে তোমাকে আমি এঘর থেকে এখুনি দিতে পারি সরযূ তবে একটি সর্তে!

সরযূ। সর্তে!

রাজে। হাঁ, তোমাকে আমি একেবারে নিশ্চিহ্নই করে দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম তোমাকে একটা সুযোগ দিলে যদি তুমি—

সরযূ। সুযোগ।

রাজে। হাঁ! সর্ত বলো বা সুযোগ বলো, তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি যদি চন্দ্রকুমারকে তুমি ভুলে যাও।

[চমকে উঠেছিল সরযূ রাজেশ্বরের কথায়। নির্বাক হয়ে থাকে সে।]

বুঝতে পেরেচো নিশ্চয়ই কি আমার বক্তব্য!

সরযূ। আপনিই তাহলে—

রাজে। রাজেশ্বর চৌধুরী! চন্দ্রকুমারের—

সরযূ। বুঝলাম।

রাজে। শোন সরযূ, তুমি যদি আমার কথা শোন, ধন দৌলত যা চাও তুমি পাবে। সোনা দিয়ে তোমার সর্বাঙ্গ আমি মুড়ে দেবো—

সরযূ। মিথ্যেই আপনি আমাকে প্রলোভন দেখাচ্ছেন চৌধুরী মশাই!

রাজে। তাহলে আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী নও।

সরযূ। না।

রাজে। বেশ। তবে জেনো তোমাকে তাহ'লে যেতে হবে আমার পাতাল ঘরে। শোন সরযূ, দু' মিনিট তোমাকে আমি সময় দিচ্ছি ভাববার। বল, চন্দ্রকুমারকে তুমি ভুলে যাবে, না আমার পাতাল ঘরে যাবে।

সরযূ। আবার বলচি, মিথ্যেই আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

রাজে। ভুল করচো তুমি সরযূ, আমি যা বলচি, এক বিন্দুও তার মধ্যে মিথ্যে নেই।

সবযূ। তবু বলবো ভুল কবচেন আপনিই—

রাজে। শোন, জাননা তুমি, পাতাল ঘরে আছে আমার একজোড়া ক্ষুধার্ত পাহাড়ী অজগব—

সবযূ। সরযূ, মৃত্যুকে ভয় কবে না।

রাজে। তাহলে কিছুতেই তুমি আমার প্রস্তাব মেনে নেবে না?

সরযূ। না।

রাজে। সরযূ, শেষ, শেষবারের মতই জেনো তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করচি, অজগরেব ভয়াবহ বিষাক্ত মৃত্যু আবেষ্টনীই চাও না, চন্দ্রকুমারকে ভুলে যেতে চাও!

সরযূ। আপনার বোধ হয় একটা কথা জানা নেই চৌধুরী মশাই, রাজপুতের মেয়েরা হাসতে হাসতে জহর ব্রত করে। ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমি সেই রাজপুত মেয়ে। নিয়ে চলুন কোথায় আপনি নিয়ে যেতে চান আমাকে—

রাজে। সরযূ!

সরযূ। বললাম তো! যত ভয়ঙ্কর, যত নিষ্ঠুর মৃত্যুই আমার

হোক না কেন, চন্দ্রকুমারকে আমি ভুলতে পারবো না। সে—সে আমার স্বামী! আমি—আমি তার স্ত্রী।

[রাজেশ্বর এবারে যেন একেবারে ক্ষেপে গেলেন ঐ 'স্ত্রী' কথাটি শুনে। চীৎকার করে উঠ্‌লেন—]

রাজে। স্ত্রী! নামগোত্রপরিচয়হীনা রাস্তার কুকুর, চৌধুরী বাড়ির বধূ হবার আশা তোর—

সরযূ। না। না—শুনুন, শুনুন,—

রাজে। দাঁড়া! তোর যোগ্য স্থানেই তোকে আমি প্রেরণ করবো—রঘুনন্দন!

[রঘুনন্দন এসে ঘরে ঢুকলো। কোমর থেকে চাবিটা নিয়ে ছুঁড়ে দেন রাজেশ্বর রঘুর দিকে।]

রঘু। হুজুর।

রাজে। এই নে! যা, পাতাল ঘরেই মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চাবিটা দিয়ে যাবি। যাও রাজপুতবালা, দেখো এবারে আমার পাতাল ঘর—যা—

[রঘুনন্দন টানতে টান্‌তে বের করে নিয়ে গেল সরযূকে। যাওয়ার সময় সরযূ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে একটা চীৎকার করে উঠতেই রঘু তার মুখে কাপড় চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। বাইরে কড় কড় করে ঐ সময় বজ্র বিদ্যুৎ হুঙ্কার দিয়ে ওঠে। জানালা পথে বিদ্যুতের আলো ঘরের মধ্যে ঝিলিক হেনে যায়। সোঁ সোঁ হাওয়ার গর্জন শোনা যায়।]

এইবার। এইবার অপর্ণা, যাবার কালে তুমি আমাকে মাত করবে ভেবেছিলে। এইবার। হাঃ হাঃ হাঃ।

[ঠিক ঐ সময় পাইক কালু রক্তাক্ত কলেবরে ঘরে এসে ঢোকে। সেদিকে নজর পড়তেই—]

একি—কালু—তোর সর্বাঙ্গে রক্ত—তোকে না বলেছিলাম আজকের রাত্রে চন্দ্রকুমারের উপরে নজর রাখতে, যেন কোনমতেই সে বাড়ি থেকে না বের হতে পারে।

কালু। পারলাম না হুজুর, পারলাম না! অতর্কিতে আমার মাথায় চোট্ দিয়ে দাদাবাবু –

রাজে। কি! কি বললি হাবামজাদা, রুখতে পারলি না একটা ছোকরাকে। তার হাতেব চোট খেয়ে, রক্ত মেখে সাফাই গাইতে এসেচিস আমাব সামনে। বেরো—

[পদাঘাত করেন রাজেশ্বর কালু পাইককে। সে পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—]

কালু। বাঘের বাচ্চা বাঘ হুজুর!

রাজে। মাধব!

[মাধব ঘরে এসে ঢুকলো—]

যা, এটাকে কাছারী ঘবে নিয়ে গিয়ে বন্ধ কবে রাখ। যা নিয়ে যা—

[কালুকে মাধব ধরে নিয়ে গেল।]

চন্দ্রকুমারকে ধরে রাখা গেল না। পালিয়ে গেল! যাক্‌গে—সরযূ! সরযূ কণ্টকতো উপড়ে ফেলেচি।

[বাইরে এমন সময় অপর্ণার কণ্ঠ শোনা যায়। অপর্ণা: না, না—যাবো আমি ভিতরে যাবো, আমাকে ছেড়ে দাও—]

কে। অপর্ণার গলা না। এই ভিতরে আসতে দে—

[অপর্ণা ঝড়ের মতই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। আবার শোনা গেল বজ্রের হুংকার, বিদ্যুতের আলো চমক দিয়ে গেল ঘরে।]

এই যে অপর্ণা, এসো—এসো

অপর্ণা। দয়া করো রাজেশ্বর, দয়া করো, সরযূ—সরযূকে আমার ফিরিয়ে দাও—

রাজে। সরযূ! আমি কি জানি তোমার সরযূর কথা!

অপর্ণা। হাঁ, হাঁ—জানো, আমি জানি, তুমিই তাকে তোমার পাইকদের দিয়ে লুঠ করিয়ে এনেচো। দয়া করো রাজেশ্বর, দয়া করো, সরযূকে আমার ফিরিয়ে দাও—

[অপর্ণা এসে রাজেশ্বরের পায়ের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।]

রাজে। ফিরিয়ে দেবো! [হঠাৎ হেসে ওঠে] হাঃ হাঃ হাঃ—

অপর্ণা। দয়া করো, ওগো দয়া করো—

রাজে। আর তো তা হয় না অপর্ণা! লৌহবাসরের দরজায় যে আমার খিল পড়ে গেছে। আর তো সে খিল খুলবে না।

অপর্ণা। পায়ে ধরছি, ওগো তোমার পায়ে ধরচি—

রাজে। বাঃ বাঃ! চমৎকার, চমৎকার লাগচে শুনতে। মাত্র তিন রাত্রি আগেকার শোনা কথার প্রতিধ্বনিটা। চমৎকার—

অপর্ণা। রাজেশ্বর, রাজেশ্বর—

রাজে। কিন্তু ভাগ্যের চাকাটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘুরে যেতে পারে, তোমাকেও যে এমনি করে ছুটে এসে আমারই

পায়ে লুটিয়ে পড়তে হতে পারে, ভাবতে পারোনি বাঘিনী রাজপুতানী, না—

[অপর্ণা তখন মাটিতে লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে।]

কাঁদচো না! কিন্তু কোথায় গেল সে রাত্রের রাজপুতানীর আগুন। জ্বালো। চৌধুরীদের ইজ্জতের গায়ে জ্বালাও আগুন।

[একটু থেমে, সরে দাঁড়িয়ে কঠোর কণ্ঠে]

না। না—পাবে না। পাবে না ফিরে তোমার সরযূকে!

অপর্ণা। না। না—ওগো দয়া করো, দয়া করো—

রাজে। নাম গোত্র পরিচয়হীনা একটা রাস্তার কুড়ানো মেয়ের সঙ্গে চাতুরী করে আমার ছেলের বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলে তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নেবে—না!

অপর্ণা। না। না—ভুল! মিথ্যা! মিথ্যা বলেচি সে রাত্রে তোমাকে রাজেশ্বর। সরযূ নামগোত্রপরিচয়হীনা নয়। বিশ্বাস করো, সে আমার, আমারই গর্ভজাত—আমারই সন্তান।

রাজে। [চমকে] তোমারই গর্ভজাত! তবে—তবে যে সে রাত্রে বলেছিলে—

অপর্ণা। মিথ্যা, মিথ্যা বলেচি। তার মুখের দিকে তাকিয়েও বুঝতে পারোনি—

রাজে। অপর্ণা! অপর্ণা—সত্যি, সত্যি বলচো, সে তোমার, তোমারই গর্ভজাত—

অপর্ণা। হাঁ, হাঁ—তোমাকে সে রাত্রে আঘাত দেবো বলেই সরযূর জন্মপরিচয় মিথ্যা করে বলেছিলাম। সরযূ আমারই সন্তান! সরযূর জন্মের পাঁচ মাস আগেই আমার স্বামী মারা যায়। সরযূর কাকারা ছিল আমার চিরশত্রু। সরযুর পৈতৃক সম্পত্তির জন্যই কৌশলে বিষপ্রয়োগে তারা স্বামীকে আমার হত্যা করে। সেই ভয়েই তার জন্মের আগেই আমি স্বামী গৃহ থেকে পালিয়েছিলাম—

রাজে। অপর্ণা!

অপর্ণা। হাঁ, সেই ভয়েই চিরদিন ওর জন্মপরিচয়টা আমি গোপন করে এসেচি। সকলকে বলেচি ও আমার কুড়ানো, পালিতা মেয়ে। এমনকি সরযূও তাই জেনে এসেচে এতকাল—

রাজে। তবু! তবু তাকে সরে যেতে হবে আজ—

অপর্ণা। ওগো, একদিন, একদিন তো তুমি আমাকে ভাল বেসেছিলে। এই অপর্ণার জন্য প্রাণ দিতেও তো চেয়েছিলে। আজ সেই অপর্ণারই একমাত্র মেয়ে যদি তোমার আত্মজকে ভালবেসেই থাকে, সে ভালবাসাকে কি তুমি স্বীকার করে আজ নিতে পারো না?

রাজে। হাঁ, সত্য কথা তোমার অপর্ণা, ভালবেসেছিলাম তোমাকে। পৃথিবীতে কেউ বুঝি কাউকে অতখানি ভালবাসতে পারে না। কিন্তু সে ভালবাসার আজ রেখামাত্রও নেই আজকের এই রাজেশ্বরের বুকে—

অপর্ণা। বেশ। তা যদি নাই পারো, অন্ততঃ ছেড়ে দাও সরযুকে—। ওই যে আমার একমাত্র সন্তান। একমাত্র সান্ত্বনা। কথা দিচ্ছি আমি, তোমার ছেলের কাছ থেকে মেয়েকে আমার জন্মের মত দূরে সরিয়ে নিয়ে যাব।

রাজে। নিয়ে যাবে! কিন্তু সেদিন তো কই এই মিনতিটুকু তোমার কণ্ঠে ফুটে ওঠে নি।

অপর্ণা। না। তোমার বাপের দেওয়া চব্বিশ বছর আগেকার সেই ক্ষত যে আজও বুক থেকে আমার শুকোয় নি। আজো—আজো যে অপর্ণার সমস্ত বুকটা ভরে একটিমাত্র মুখই জেগে আছে।

রাজে। অপর্ণা--অপর্ণা –

অপর্ণা। হাঁ, হাঁ—সেদিনের সেই মুখের অভিমানটাই তুমি শুনতে পেলে কেবল, আর এই চব্বিশটা বছর ধরে যে কান্না এই বুকের মধ্যে জমাট হয়ে রয়েচে, সেটা তুমি শুনতে পেলে না রাজেশ্বর—

রাজে। অপর্ণা! অপর্ণা—

অপর্ণা। ওগো—

রাজে। এসো, এসো অপর্ণা, যেমন করে হোক আমি চেষ্টা করবো বাঁচাতে তোমার সরযূকে—। হয়তো এখনো চেষ্টা করলে—

অপর্ণা। কি বলচো তুমি –

রাজে। আমার পাতাল ঘরে। পাতাল ঘরে পাঠিয়ে দিয়েচি সরযূকে—সেখানে রয়েচে একজোড়া পাহাড়ী অজগর—

অপর্ণা। [চীৎকার করে] য়্যাঁ! এ তুমি কি করলে গো। এ তুমি কি করলে।

রাজে। এসো—এসো—

[ঝড়ের বেগে অপর্ণার হাত ধরে টানতে টানতে রাজেশ্বর ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। অন্ধকার হয়ে মঞ্চ ঘুরে যায়।]

॥ দৃশ্য : দুই ॥

[চৌধুরী বাড়ির মধ্যস্থিত একখানি ঘর। ঘরটি সম্পূর্ণ খালি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এককোণে কেবল একটি লোহার সিন্দুক। আর ঘরের মধ্যে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি মহিলার এনলার্জ ছবি। কপালে সিন্দুর। মাথায় লাল চওড়া পাড পরিধেয় শাড়ীর অবগুণ্ঠন। প্রশান্ত কপাল। টানা টানা দুটি চক্ষু। অপরূপ সুন্দরী। তার ঠিক নিচেই একটি কুলঙ্গী। তার মধ্যে একটি রূপার সিন্দুরের ঝাঁপি। ও পাশে ছোট একটি রূপার পিলসুজ জ্বলছে মিটি মিটি একটি প্রদীপ শিখা। নববধূ স্বর্ণলতার হাত ধরে এসে সেই ঘরে প্রবেশ করলো মাধবী সন্তর্পণে। ঘরের একদিকে মাত্র একটি জানালা।]

স্বর্ণলতা। এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে মাধবী!

মাধবী। একটু আগে তোমাকে যে ঘরের কথা বলছিলাম বৌ, এ বাড়ির লক্ষ্মী ঘর।

স্বর্ণ। এই সেই ঘর!

মাধবী। হাঁ, ঐ যে দেওয়ালে টাঙ্গানো দেখছো ছবিটা, ঐ হচ্ছে এই চৌধুরী বাড়ির বধূরাণী ভানুমতীর ছবি! যাও প্রণাম করো—

[এগিয়ে গিয়ে, প্রণাম করে ছবির নিচে গলবস্ত্র হয়ে স্বর্ণলতা। তারপর উঠে দাঁড়াতেই] ঐ ভানুমতীই সঙ্গে করে এনেছিলেন তিন পুরুষ আগে এই চৌধুরী বাড়িতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। দুধে আলতা পা ফেলে এবাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে এবাড়ির ঐশ্বর্য যেন উথলে উঠেছিল—কিন্তু—

স্বর্ণ! কিন্তু—

মাধবী। শুনেচি মাত্র দশ বৎসর ঘর করবার পরই নিজের স্বামী—রাজা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে এক নর্তকীর দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে গিয়ে, সেই নর্তকীকে এক রাত্রে জলসা ঘরে গিয়ে ছোরা চালিয়ে হত্যা করে—

স্বর্ণ। সত্যি ?

মাধবী। হাঁ, নর্তকীকে হত্যা করে ভানুমতী এবাড়িতে আর ফিরে এলেন না।

স্বর্ণ। ফিরে এলেন না!

মাধবী। না! কৃষ্ণ সায়েরের অথৈ জলে ডুব দিলেন।

স্বর্ণ। তারপর ?

মাধবী। মৃতদেহর কিন্তু কোন সন্ধানই আর মেলেনি। যাই হোক, ভানুমতীর একমাত্র পুত্র—জগৎনারায়ণ চৌধুরী তখন মাত্র আট বৎসরের বালক! এই ঘরটিই ছিল ভানুমতীর শয়ন ঘর।

স্বর্ণ। এই ঘর ?

মাধবী। হাঁ, জগৎনারায়ণের স্ত্রী এবাড়িতে বধূ হয়ে আসবার পর রাত্রে একদিন স্বপ্ন দেখলেন, রক্ত লাল চওড়া পাড় শাড়ী পরে ভানুমতী যেন সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, বৌমা, আমার ঘরে কুলুঙ্গিতে যে লক্ষ্মীর ঝাঁপি আছে তাকে প্রত্যহ সিন্দুর দিয়ে পূজা করো, লক্ষ্মী অচলা থাকবেন তাহলে চিরদিন তোমার সংসারে। সেই থেকেই এবাড়ির বধূরা ঐ লক্ষ্মীর ঝাঁপির পূজা করে এসেচে সিন্দুর দিয়ে—

স্বর্ণ। সিন্দুব দিযে ?

মাধবী। হাঁ, নিজেব সিঁথি থেকে সিন্দুব নিয়ে।

[স্বর্ণ একবাব মাধবীর মুখেব দিকে তাকিযে ক্ষণকাল কি যেন ভাবলো, তাবপব এগিয়ে গেল কুললক্ষ্মীব সামনে। নিজেব সিঁথিব সিন্দুব থেকে সিন্দুব নিয়ে ঝাঁপিব গায়ে এঁকে দিল একটি টিপ। সহসা এমন সময় একটি ক্ষীণ ক্রন্দনেব স্বব যেন ভেসে এলো। সেই শব্দ শুনে স্বর্ণ চমকে উঠে]

স্বর্ণ। ও কি—

মাধবী। কি ? কি হলো বৌ ?

স্বর্ণ। শুনতে পাচ্ছো না মাধবী, কে যেন কাঁদচে।

মাধবী। কাঁদচে ?

স্বর্ণ। হাঁ, হাঁ—শুনতে পাচ্ছো না কে যেন বুক ভাঙ্গা কান্না কাঁদচে—

মাধবী। [কান পেতে শুনে] হাঁ, তাই তো। আশ্চয! কে এমন কবে কাঁদচে—

[সহসা এমন সময় দবজা খুলে জাহ্নবী এসে সেই ঘরে প্রবেশ করে মাধবী ও স্বর্ণকে ঘবেব মধ্যে দেখে চমকে ওঠে।]

জাহ্নবী। একি! বৌমা, মাধু—

মাধবী। মা।

জাহ্নবী। তোরা এত বাত্রিবে এঘরে? কি হয়েচে মাধু?—বৌমাই বা আজকের বাত্রে ঘব ছেড়ে এসেচো কেন?

মাধবী। কিন্তু কে যেন কাঁদচে মা, শুনতে পাচ্ছো—

[জাহ্নবী কোন সাড়া দেয় না, চুপ কবে থাকে।]

মাধবী। মা! মা—

[কান্নাটা তখন যেন আরো স্পষ্ট শোনা যায়।]

জাহ্নবী। ভানুমতী, ভানুমতী কাঁদচে মাধু! এ ভানুমতীর কান্না। অমঙ্গলের পূর্বাভাষ। ঐ কান্না শুনেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। তাইতো এঘরে ছুটে এসেচি!

মাধবী। অমঙ্গল!

জাহ্নবী। হাঁ, হাঁ—কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা হলেই এমনি করে ভানুমতীর কান্না নাকি শোনা যায়—

[এমন সময় বাইরে চন্দ্রকুমারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। নেপথ্যে চন্দ্রকুমার : মা! মা—]

কে! চন্দ্র!…চন্দ্র—এই যে, আমি এঘরে—

[ঝড়ের মতই পরমুহূর্তে চন্দ্র এসে ঘরে ঢুকলো।]

চন্দ্র। মা! মা—

জাহ্নবী। [ব্যাগ্র কণ্ঠে] কি! কি হয়েচে চন্দ্র!…

চন্দ্র। পাতাল ঘরে, আবার—আবার বাবা বন্দী করেচেন—

জাহ্নবী। [চীৎকার করে] পাতাল ঘরে!

চন্দ্র। হাঁ—হাঁ—বাঁচাও মা। তাকে বাঁচাও—

জাহ্নবী। কিন্তু, কে কাকে বন্দী করলে? কাকে বাঁচাবো?

চন্দ্র। সরযূ! সরযূকে! তাকে বাঁচাও মা, তাকে বাঁচাও—

জাহ্নবী। সরযূ! কে, কে সরযূ!

চন্দ্র। সরযূ! সরযূ তোমার পুত্রবধূ মা—

জাহ্নবী। চন্দ্র!

চন্দ্র। হাঁ মা, হাঁ - সেই আমার মনোনীতা স্ত্রী! মনে মনে রাত্রির দেবতাকে ও প্রদীপ শিখাকে সাক্ষী রেখে তাকেই যে আমি প্রথম জীবনে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছিলাম মা!—

জাহ্নবী। চন্দ্রকুমার—

চন্দ্র। হাঁ মা, হাঁ—আমি জানি, বাবা যাকে নিশ্চিহ্ন করতে চান, তাকে তাঁর পাতাল ঘরেই বন্দী করেন। তুমি না একদিন বলেচিলে মা, পাতাল ঘরেব আর একটা চাবি আছে। দাও মা, দাও, সেই চাবিটা দাও সরযূকে বাঁচতে দাও মা—

জাহ্নবী। না!—

চন্দ্র। মা!

জাহ্নবী। [বারেকের জন্য অদূরে পাথরেব মত দণ্ডায়মান পুত্রবধূ স্বর্ণর দিকে চেয়ে কঠিন কণ্ঠে] না, আজ আর তা সম্ভবপর নয় চন্দ্র -

চন্দ্র। মা। মা গো—

জাহ্নবী। না চন্দ্র, সরযূর বাঁচা হতে পারে না।

চন্দ্র। মা!

জাহ্নবী। হাঁ, এবাড়ির বধূর আসনে চিরদিন একজনই বসে এসেচে। এই জেনো এবাড়ির বধূরাণী ভানুমতীর নির্দেশ। স্বর্ণই তোমার একমাত্র বধূ—

[বলতে বলতে জাহ্নবী দৃঢ়পদে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে উদ্যত হয়।]

চন্দ্র। মা! মা—

জাহ্নবী। না। [জাহ্নবী ঘর থেকে বের হয়ে যায়। মাধবীও মাকে অনুসরণ করে। ঘরে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল স্বর্ণ ও চন্দ্রকুমার।]

চন্দ্র। দেবে না, চাবি তাহ'লে দেবে না। বেশ! সরযূকে আমি বাঁচাবোই! দেখি, চৌধুরী বাড়ির তোমরা সকলে কেমন করে আমাকে বাধা দাও—।

[এগিয়ে যায় চন্দ্রকুমার দরজার দিকে।]

স্বর্ণ। শুনছো—

চন্দ্র। কে! ও স্বর্ণলতা!

স্বর্ণ। আমি—আমাকে আপনি সঙ্গে নেবেন!

চন্দ্র। তোমাকে!

স্বর্ণ। হাঁ—

চন্দ্র। কিন্তু তুমি, তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

স্বর্ণ। আপনি যেখানে যাচ্ছেন।

চন্দ্র। আমি! আমিতো যাচ্ছি—

স্বর্ণ। জানি সরযূকে উদ্ধার করতে পাতাল ঘর থেকে!

চন্দ্র। [বিস্ময়ে] স্বর্ণ!

স্বর্ণ। কিন্তু দেরি করচেন কেন মিথ্যে! চলুন—

চন্দ্র। সত্যি বলচো তুমি—

স্বর্ণ। হাঁ! চলুন –

চন্দ্র। শুনেচি সেখানে বড় অন্ধকার। একটা আলো—

[মুহূর্তকাল স্বর্ণ কি যেন ভাবে। তারপর দৃঢ়পদে এগিয়ে গিয়ে

কুলঙ্গীস্থিত লক্ষ্মীব ঝাঁপি ও ছবিকে প্রণাম কবে, প্রদীপদান থেকে প্রদীপটি তুলে নিয়ে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে বলে।]

স্বর্ণ। চলুন।

চন্দ্র। স্বর্ণ!

স্বর্ণ। চলুন।

[দু'জনে এগিয়ে যায় দবজার দিকে। মঞ্চ অন্ধকাব হয়ে যায়। মঞ্চ ঘুরে যাবে। মঞ্চ কিছুক্ষণেব জন্য অন্ধকাব থাকবে। সেই অন্ধকাবে শোনা যাবে ঘন ঘন বজ্র বিদ্যুতেব হুংকাব। বিদ্যুতেব চকিত আলোব ঝলক। আর শোনা যাবে সেই কান্নাব সুব। ক্রমে তাব মধ্যে মঞ্চ প্রকাশ পাবে অন্ধকাবেই।]

॥ দৃশ্য : তিন ॥

[অন্ধকাব। পাতাল ঘরের সম্মুখ ভাগ। একটা ভাঙ্গা ইট্ বের করা অন্ধকার চাতাল দেখা যাচ্ছে। উপর থেকে ধাপে ধাপে বেঁকে সিঁড়ি নেমে এসেছে নিচের চাতাল পর্যন্ত। সিঁড়ির মাথায় একটা ভেজানো দরজা! চাতালের মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছে বিরাট পাল্লা-ওয়ালা দুটি একটি দরজা। দরজার গায়ে সব লোহার বল্টু বসানো। অন্ধকারেও চক্ চক্ করচে। সেই দরজার গায়ে দেখা গেল পিছন ফিরে তালা লাগাচ্ছে রঘুনন্দন। সিঁড়ির মাথার দরজা খুলে গেল। প্রথমে চন্দ্রকুমার ও পশ্চাতে স্বর্ণলতাকে প্রদীপ হাতে দেখা গেল। সিঁড়ি দিয়ে তারা নামতে থাকে। চন্দ্রকুমারের হাতে একটা লাঠি।]

চন্দ্র। উঃ কি অন্ধকার! আলোটা একটু তুলে ধরতো স্বর্ণ—

[স্বর্ণ হাতের প্রদীপ তুলে ধরে। সেই আলোয় চন্দ্রকুমার সিঁড়ি দিয়ে লাঠি হাতে নামতে থাকে। স্বর্ণ তার পিছনে পিছনে নামে। হঠাৎ তাদের কণ্ঠস্বরে চমকে রঘুনন্দন ফিরে তাকায়।]

রঘু। [সবিস্ময়ে] একি! দাদাবাবু—

[সিঁড়ির শেষ ধাপে চন্দ্র এসে তখন দাঁড়িয়েচে। পশ্চাতে স্বর্ণ]

চন্দ্র। রঘুদা?

রঘু। কিন্তু তুমি, এতরাত্রে এখানে!

চন্দ্র। হাঁ আমি! চাবিটা দাও রঘুদা—

রঘু। চাবি! •

চন্দ্র। আঃ, আমি পাতাল ঘরে যাবো, চাবিটা দাও!

রঘু। পাতাল ঘরে যাবে! তুমি কি ক্ষেপে গেলে দাদাবাবু!

চন্দ্র। বেশি কথা বলবার আমার সময় নেই রঘুদা, চাবিটা দাও—

রঘু। কিন্তু চাবি তো আমি দিতে পারবো না।

চন্দ্র। দিতে পারবে না!

রঘু। না। হুজুরের হুকুম ছাড়া পাতালঘরের চাবি তো আমি কারো হাতে দিতে পারবো না দাদাবাবু!

চন্দ্র। রঘুদা—

রঘু। না দাদাবাবু, লক্ষ্মী আমার কথা শোন। ফিরে চলো!

চন্দ্র। চাবি আমাকে তোমায় দিতেই হবে রঘুদা! কেন মিথ্যে দেরি করছো—দাও, চাবিটা দাও!

রঘু। তা হবার নয় দাদাবাবু!

চন্দ্র। রঘুদা, তবে আমার কথায় তুমি চাবি দেবে না?

রঘু। না।

চন্দ্র। দেবে না?

রঘু। না!

চন্দ্র। বেশ! তবে তুমি আমাকে বাধ্য করলে—

[চকিতে লাঠিটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো চন্দ্রকুমার রঘুনন্দনের উপরে। প্রতিরোধ করে রঘু।—]

রঘু। দাদাবাবু!

[লাঠির আঘাতে ততক্ষণে চোট খেয়ে বসে পড়েছে রঘু চাতালের উপরে। তার উপরে ঝাপিয়ে পড়ে হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নেয় চন্দ্রকুমার, তালা খুলতে থাকে।]

দাদাবাবু, কি করছো, কি করছো—ঢুকো না, ঢুকোনা ও ঘরে—

[তালা খুলে ফেলে ততক্ষণে চন্দ্রকুমার 'সরযূ সরযূ' বলে পাতাল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।]

চন্দ্র। সরযূ। সরযূ—কোথায়, কোথায় তুমি!—

[ডাকতে ডাকতে চন্দ্রকুমার পাতাল ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল।—]

রঘু। দাদাবাবু! দাদাবাবু, ঢুকোনা! ঢুকোনা পাতাল ঘরে—

[পা টেনে টেনে কোনমতে দাদাবাবু, দাদাবাবু বলে ডাকতে ডাকতে রঘুনন্দনও পাতাল ঘরে অদৃশ্য হয়ে যায়। স্থাণুর মত একাকী প্রদীপ হাতে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকে খোলা দরজার সামনে স্বর্ণলতা। খোলা দরজা পথে একটা ভয়াবহ ক্রুদ্ধ গর্জন ভেসে আসে। আর সেই সঙ্গে দূর হতে শোনা যায় নেপথ্যে চন্দ্রকুমার ও রঘুর গলা।

চন্দ্র ঃ সরযূ! সরযূ—

রঘু ঃ দাদাবাবু! দাদাবাবু!—

আর ঐ সময় সিঁড়ির মাথায় দেখা গেল অপর্ণা ও রাজেশ্বর কে। তাড়াতাড়ি রাজেশ্বর সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন। তার পশ্চাতে ছুটে আসে জাহ্নবী!]

জাহ্নবী। চন্দ্র! চন্দ্র—

[চকিতে ফিরে তাকায় রাজেশ্বর।]

রাজে। একি! জাহ্নবী, তুমি, তুমি এখানে!

জাহ্নবী। চন্দ্র! আমার চন্দ্র কোথায়।

রাজে। চন্দ্র! কি বলচো তুমি জাহ্নবী!

জাহ্নবী। হাঁ, পাতাল ঘরের চাবি দিই নি বলে ছুটে এসেচে সে এখানে সরযূকে বাঁচাবে—

রাজে। একি! পাতাল ঘরের দরজা খোলা কেন! বৌমা!

জাহ্নবী। বৌমা, চন্দ্র—চন্দ্র কোথায় ?

স্বর্ণ। ঐ ঘবেব ভিতবে ঢুকেচেন—

রাজে। সেকি ! কি বলচো তুমি বৌমা, পাতালঘবে যে একজোড়া পাহাড়ী অজগব আছে—

অপর্ণা ! [হঠাৎ পাগলেব মত চীৎকাব কবে] সবযূ ! সবযূ—

[ছুটে অপর্ণা খোলা দবজা পথে পাতাল ঘবে অদৃশ্য হয়ে যায়।]

স্বর্ণ। য়্যাঁ ! সেকি—

রাজে। আমি যাই ! আমি যাই—চন্দ্র ! চন্দ্র—

[ডাকতে ডাকতে বাজেশ্বব পাতাল ঘবে অদৃশ্য হলেন, তাব পশ্চাতে স্বর্ণও অদৃশ্য হয়ে গেল প্রদীপটা ফেলে দিয়ে, গর্জন শোনা যেতে লাগলো অন্ধকাবে। দূব থেকে বাজেশ্ববেব গলা ভেসে এলো

বাজে : চন্দ্র। চন্দ্রকুমাব—]

জাহ্নবী। চন্দ্র। চন্দ্র

[জাহ্নবীও ছুটে পাতাল ঘবে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ভূকম্পনেব শব্দ, দেওয়াল ফেটে যাচ্ছে। চূণ বালি খসে খসে পড়চে, আব শোনা যাচ্ছে সেই ক্রুদ্ধ গর্জন।]

* * *

[ধীরে ধীরে সব ঠাণ্ডা হয়ে এলো। দেখা গেল খোলা পাতাল ঘরের দরজা পথে কেবল বেব হয়ে আসচে চন্দ্রকুমাব, স্বর্ণলতার কাঁধে ভর দিয়ে। এলোমেলো কেশ, রক্তের দাগ, বিস্রস্ত বেশ। স্বর্ণরও তাই। সব মলিন

ছিন্ন। কপালে ঘাম। ধীরে ধীরে এসে চাতালের উপরে বসলো চন্দ্র।]

স্বর্ণ। বোস। এখানে একটু বোস—

চন্দ্র। হাঁ, একটু বসি! আঃ!

[অঞ্চল দিয়ে সস্নেহে স্বর্ণ স্বামীর কপালের রক্ত মুছিয়ে দিতে থাকে। হঠাৎ স্বর্ণর একটা হাত ধরে ফেলে চন্দ্রকুমার! ডাকে।]

চন্দ্র। স্বর্ণ!

স্বর্ণ। বলো!

চন্দ্র। পারলাম না সরযূকে বাঁচাতে, পারলাম না—

স্বর্ণ। কে বললে পাবোনি! নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখো, দেখবে সরযূ তো হাবায়নি—সেকি হারাতে পারে!

চন্দ্র। স্বর্ণ! স্বর্ণলতা!

স্বর্ণ। হাঁ!

চন্দ্র। আমাকে, আমাকে ক্ষমা করো স্বর্ণ! না বুঝে তোমাকে—

স্বর্ণ। ছিঃ ও কথা বলতে নেই! চলো, ওঠো—

[দু'জনে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে মিলিয়ে যায়।]

যবনিকা